হিন্দু-সমাজ।

শ্রীঅনাদিচরণ তরফদার
প্রণীত।

জামিরতা, পাব্‌না হইতে
শ্রীবিধুরঞ্জন সান্ন্যাল বি, এল, কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা,
৬৬, মাণিকতলা ষ্ট্রীট্, বাণী প্রেসে,
শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।
১৩২০ সাল।

মূল্য।০ চারি আনা।

উৎসর্গ পত্র।

পরম পূজনীয় অশেষগুণসম্পন্ন ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য জমিদার
স্বর্গীয় বিনোদলাল পাকড়াশী মহাশয়
শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

দেব! আপনি রাজনীতিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, ও ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন, এবং সর্ব্বদা শাস্ত্রালোচনায় কালক্ষয় করিতেই ভালবাসিতেন। হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে যদি কিছু আমার জ্ঞান জন্মিয়া থাকে সে আপনার প্রসাদে। সেই জন্য আমার বহুপরিশ্রমের হিন্দু সমাজ আপনার শ্রীচরণে উপহার স্বরূপ প্রদান করিব, এই বাসনাই আমার ছিল; কিন্তু যাঁহার উপর সংশোধন করিয়া দিবার ভার ছিল, কলিকাতার সেই স্বনামধন্য বুধাগ্রগণ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তৎকালে নানাকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়া পুস্তকের মুদ্রাঙ্কনে বহু বিলম্ব হইল, এদিকে আপনি স্বজ্ঞানে মোক্ষক্ষেত্র বারাণসীধামে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া শিবসাযুজ্য লাভ করিলেন, এক্ষণে আপনার পুত্রগণ আপনার তৃপ্ত্যর্থে বিষ্ণুপ্রীতিকামে তর্পণ করিতেছে, আমিও আপনি শাস্ত্রালোচনায় কালক্ষয় করিতে ভাল বাসিতেন বলিয়া হিন্দু-সমাজ আপনার শ্রীচরণেই সমর্পণ করিলাম। নিবেদন ইতি—

পোঃ সদিয়া চাঁদপুর, পাবনা। | সেবক
৮ই শ্রাবণ, ১৩২০ সাল। | শ্রীঅনাদিচরণ তরফদার।

বিজ্ঞাপন।

বহুদিন হইল হিন্দু-সমাজের দুরবস্থা দর্শনে আমার মনে বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজ সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিবার বাসনা জন্মে, কিন্তু অশেষ প্রকার বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত থাকা প্রযুক্ত এতদিন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। কতিপয় বৎসর হইল, স্বদেশ-হিতৈষী সিরাজগঞ্জের বিখ্যাত এসিস্‌ট্যাণ্ট সার্জ্জন ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু শশীধর গুহ নিয়োগী মহাশয়ও হিন্দু-সমাজ নামক একখানি পুস্তক লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, এবং অনেক উপদেশও দিয়াছিলেন; আজ আমার যথার্থ বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায় বি, এ, মহোদয়ের সর্ব্বপ্রকার সাহায্যে হিন্দু-সমাজ জনসমাজে প্রকাশ করিলাম। যদি ইহা পাঠ করিয়া পাঠকবৃন্দ কিঞ্চিন্মাত্র উপকার বোধকরেন, তাহাহইলে আমার সকল শ্রম সফল জ্ঞানকরিব।

অবশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে জ্ঞাপন করিতেছি যে কলিকাতার বিখ্যাত বাণীর বরপুত্র, মেট্রপলিটন কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইহার আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছেন। সেজন্য আমি তাঁহরা নিকট চিরকালের জন্য কৃতজ্ঞতা সূত্রে আবদ্ধ রহিলাম।

পুস্তকখানি তাড়াতাড়ি যন্ত্রস্থ করাহেতু ভ্রমপ্রমাদ থাকা অসম্ভব নহে। যদি সহৃদয় পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ উহা দর্শাইয়া দেন, তাহা সাদরে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে। নিবেদন ইতি, ৮ই শ্রাবণ, ১৩২০ সাল।

শ্রীঅনাদিচরণ তরফদার
পোঃ সদিয়া, চাঁদপুর, পাবনা।

উদ্বোধন।

মঙ্গলময় বিধাতার রাজ্যে সকলেই সুখী, সকলেই সংসারকে সুখের স্থান বলিয়া আনন্দে বিভোর! কেবল আমিই ইহা যন্ত্রণাময় অনুভব করিতেছি কেন? আমার প্রাণ সর্ব্বদা কাঁদে কেন? হিন্দু-সমাজের দুরবস্থাদর্শন করিয়া আমি ব্যথিত হইলে কি হইবে? আমার কি শক্তি আছে? আমি কি করিতে পারি? যাঁহারা দেশের গণ্যমান্য লোক, যাঁহাদের কার্য্য করিবার শক্তি আছে, তাঁহারা ত ভ্রমেও একবার দেশের কথা ভাবিবেন না, তাঁহাদের কাছে এসব কথা বলিতে গেলে হয়ত পাগল বলিয়া উপহাস করিবেন। মহাজনশ্রেণী আছেন, ব্যবসার ছলে দরিদ্রের যথা সর্ব্বস্ব হরণ করিবেন আর দলে দলে বসিয়া বৃথা কথায় ও পরের নিন্দায় সময় অতিবাহিত করিবেন। নিজের বেশভূষা, নিজের আসবাব, নিজের ভোজন পারিপাট্য প্রভৃতিই তাঁহার জীবনের সর্ব্বগ্রাসীলক্ষ্য। তাঁহার স্বজাতি নাই, স্বদেশ নাই, আত্মীয় স্বজন নাই, জ্ঞাতি নাই, কুটুম্ব নাই, আত্মাই তাহার সর্ব্বস্ব, দেশ রসাতলে যাউক, সমাজ ছারখার হউক, আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি কুটুম্ব অনাহারে মরুক, সে সকল ভাবিয়া মাথা ঘুরাইবেন কেন?

যে সকল উন্মত্ত যুবকের খাইয়া দাইয়া আর কাজ নাই, তাহারাই ঐ সকল পাগলামী লইয়া থাকুক, তাঁহার স্বার্থ-সর্ব্বস্বমন এই বলিয়া কথঞ্চিৎ আত্মগ্লানির হাত এড়াইয়া থাকে। দুঃখের কথা কি বলিব? যাঁহারা জনক-জননীকে অন্ধ করিয়া, প্রিয়তমা পত্নীকে পাগলিনী করিয়া সাত সমুদ্র তেরনদী পার হইয়া বিলাত গমন করেন, সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা শিক্ষিত হইয়া দেশে আসিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানালোকে আঁধার ভারতের লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার করিবেন, কিন্তু হায়! আমরা তখন তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে দেখিতে পাই, বিলাত হইতে দেশে পদার্পণ করিয়াই বাঙ্গালীর অর্দ্ধ আচ্ছাদিত দেহ দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন হন, তাহাদের সঙ্গে মেশামেশী করিতে, এমন কি ভাই বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিতেও লজ্জা বোধ করেন।

এদিকে জমিদার শ্রেণী বিলাসিতার ক্রোড়ে চির-পালিত, পরেব দুঃখ কেহই বোঝেন না, কেন না, অভাব কি তাহা তিনি জানেন না। তিনি কিরূপে দরিদ্র প্রজার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিবেন, সেই চিন্তাতেই ব্যস্ত, এবং প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত চাটুকারবর্গে পরিবেষ্টিত, তাহাদের মুখনিঃসৃত যশঃসৌরভে তাঁহার চিত্ত সতত আমোদিত। নিজের প্রচুর অর্থ আছে বলিয়া কোন চিন্তাই করিতে হয় না, পরের জন্য কিরূপে ভাবিতে

হয়, সে শিক্ষাও তিনি পান নাই; এইরূপে তিনি ক্রমে স্বার্থ পরার্থ-বিহীন এক মুক্তপুরুষ হইয়া উঠেন, কিন্তু পূর্ণ-মুক্তি তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে না, কেন না তিনি সকল বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়াও এক বিষয়ে স্পৃহাবান। তিনি উপাধি-ভিখারী। অর্থের সদ্ব্যবহার বা অসদ্ব্যবহারের দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই—তিনি দেখিতে চান কেবল খবরের কাগজে তাঁহার নাম উঠিল কিনা? এইরূপ অন্তঃসারশূন্য, নির্লক্ষ, ভোগতুষ্ট, ভাবিদর্শন-বিরহিত, স্বার্থ মোক্ষ জড়পিণ্ড সকল লইয়া আমাদের সমাজ গঠিত। এই জন্যই আমাদের জাতীয় জীবন নাই। জাতীয় গৌরব নাই, জাতীয় মমতা নাই, আর কত লিখিব? মর্ম্মভেদী জাতীয় দুর্গতির কথা আর যে লেখনীতে লিখিতে পারি না, যাঁহাদের নিন্দা করিতেছি, তাঁহারাই ত দেশের প্রাণ। ভাই সব! ক্ষমা কর। আমার তিরস্কারের উদ্দেশ্য বুঝিয়া আত্ম-দোষ সংশোধন কর। এখন আমোদের সময় নয়, উন্মত্তের ন্যায় নির্লক্ষ্য হাসি হাসিয়া দিন কাটাইওনা, জাতীয় তরি ডুবু ডুবু হইয়াছে, এখন নৃত্য রাখ। একার কাজ নয়, এস সকলে মিলিয়া জল ছেঁচিতে আরম্ভ করি, দেখি তরি বাঁচাইতে পারি কি না?

অশুদ্ধি সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	২১	সমস্ত	সমস্ত
১৫	১২	বেদগাতা	বেদগায়ী
৩১	১৭	লূতাতণ্ডু	লূতাতন্তু
৩২	৪	লূতাতণ্ডু	লূতাতন্তু
৩২	৮	কল	ফল
৩২	১৩	অজয়	অজেয়
৩২	১৬	মুসলমানের	মুসলমানেরা
৩১	১৬	আমাদিগের	আমাদিগকে
৩৯	৫	ইচ্ছা	এ ইচ্ছা
৫০	১	সমাজ	সমাজে
৫৬	১০	হইলে	হইল
৬৫	১২	জাতির	জগতের
৬৭	৩	কালীন	কানীন
৭১	১১	তাহাকে	তাঁহারা
৭১	১৪	তিনি	যিনি
৭২	২০	বলেন যে	বলেন না কে
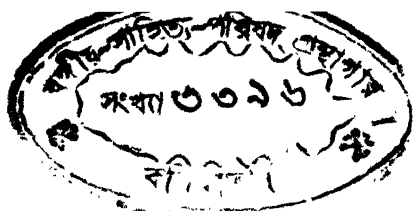
হিন্দু-সমাজ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হিন্দুসমাজ বলিতে গেলেই আগে হিন্দুশব্দের অর্থ কি তাহা জানা আবশ্যক। আমাদের কোনও শাস্ত্রীয় গ্রন্থে এই হিন্দু শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাইনা; তবে এ হিন্দু শব্দ কোথা হইতে আসিল? কেহ কেহ বলেন সিন্ধুনদ শব্দের অপভ্রংশ হইতে হিন্দু শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। কেহ বলেন হিন্দু শব্দে পারস্য ভাষায় কৃষ্ণবর্ণ যে জাতি সেই জাতিকে বুঝায়, আবার কেহ বলেন যে হিংসুক যে জাতি সেই জাতিই হিন্দু বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। কামধেনু-তন্ত্রে একথার সত্যতাও উপলব্ধি করা যায়। তাহাতে লিখিত আছে 'হীনং দুষয়তে যস্য স হিন্দুঃ' কিন্তু এই কামধেনু-তন্ত্রও পৌরাণিক নহে; আধুনিক। সুতরাং এই হিন্দু শব্দও আধুনিক।

আর্য্য শব্দই অতি প্রাচীন, এবং আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। ঋ ধাতু ণ্যৎ প্রত্যয় করিয়া আর্য্য শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; ঋ ধাতুর অর্থ গমন, একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিয়া আধিপত্য বিস্তার করে যে সেই আর্য্য। এই আর্য্য জাতির উৎপত্তি এবং বিস্তৃতি সম্বন্ধে ঋগ্বেদে এইরূপ লিখিত আছে যে, হিমালয়ের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে এই জাতির প্রথম উৎপত্তি হয়, পরে তথা হইতে ক্রমশঃ সমগ্র পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য মতেও ককেশস্ পর্ব্বতের নিকট

এই জাতির প্রথম উৎপত্তি, সেই জন্যই এই জাতির লোক-সমূহকে ককেশীয় বর্ণের লোক বলে। তদ্ভিন্ন কেহবা ইরাণ, কেহবা হিন্দু কেহবা ইউরোপীয় বলিয়াও অভিহিত করেন। হিন্দু পারসিক, গ্রীক, রোমক, ইংরেজ, ইয়ানি, জর্ম্মেণ, রুষ, ওলন্দাজ দিনেমার, পর্ত্তুগিজ প্রভৃতি জাতি আর্য্যবংশ সম্ভূত। আর্য্যদিগের আদিম বাসস্থান ইউরোপের পূর্ব্ব ও এসিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগ। উহাদের অবয়ব সুশ্রী বর্ণ শ্বেত; মস্তক গোল, মুখ ডিম্বাকৃতি, নাসিকা অল্পায়ত, বাহুদ্বয় প্রসারিত করিলে শরীরের দৈর্ঘ্যের সমান হয়। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, কতিপয় মূল-ভাষা হইতে পৃথিবীতে প্রায় চারি সহস্র ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। আর্য্যদিগের মূল-ভাষা আটটি। তন্মধ্যে আবার সংস্কৃত ও ল্যাটিন প্রধান। সংস্কৃত হইতে যেমন এসিয়ার সমস্ত ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে; সেইরূপ ল্যাটিন হইতেও ইউরোপেও বহু ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে; এই দুইটি বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিব। আর্য্যদিগের ভাষার প্রধান লক্ষণ এই যে, শব্দের পূর্ব্বে উপসর্গ ও শেষে বিভক্তি যোগ করিয়া উহার অর্থান্তর করিতে হয়। সংস্কৃত ও ল্যাটিন ভাষায় যাঁহাদের জ্ঞান আছে তাঁহারা ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা এই সমস্ত ভাষাভাষী তাঁহারাই বিদ্যাবুদ্ধিতে পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

যাঁহারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ভারতীয় আর্য্য। আর্য্যেরা ভারতে আসিয়া দেশীয়গণ অপেক্ষা আপনাদিগের বর্ণগত উৎকর্ষ দেখিয়া সর্ব্ব প্রথমে শ্বেত কৃষ্ণ দ্বারা শ্রেণী বিভাগ আরম্ভ করেন। তাঁহারা

আপনাদিগকে আর্য্যবর্ণ ও দেশীয়দিগকে অনার্য্যবর্ণ বলিয়া অভিহিত করেন। শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ হইতে ক্রমে আর্য্য অনার্য্য শ্রেণী-বিভাগ হয়। এই রূপে গাত্র-বর্ণ হইতে ক্রমে জেতা ও বিজীতরূপে রাজ-নৈতিক শ্রেণী বিভাগের উৎপত্তি হয়। বিজয়ী আর্য্যদিগের মধ্যে তখন এক মাত্র বর্ণ ছিল। সকল আর্য্যই সমান ছিলেন। সেই সত্য যুগে আর্য্যেরা আপনাদিগের মধ্যে সাম্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। আর্য্য ঔপনিবেশিক-গণের মধ্যে ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, অজ্ঞান, বীর ও ভীরু সবাই সমান ছিলেন। সকলেই পরস্পরকে ভাই ভাই বলিয়া মনে করিতেন। স্ত্রীজাতির প্রতি অবিশ্বাস ছিলনা, সুতরাং অবরোধপ্রথাও ছিলনা। স্ত্রীপুরুষ সকলেই স্বাধীন অথচ সকলেই পরস্পরের মমতাপূর্ণ। উভয় জাতির প্রতি একই বিধি ব্যবস্থাপিত। মিথ্যা প্রবঞ্চনা কাহাকে বলে তাহা তাঁহারা জানিতেন না। তাঁহারা সরলতার ও সত্যপ্রিয়তার এক একটী জীবন্ত দৃষ্টান্ত ছিলেন।

কিন্তু তাঁহাদিগের সেই পবিত্র হৃদয়াকাশে একখানি কাল মেঘ উদিত হইয়াছিল। ক্রমে সাম্যময় আর্য্য ঔপনিবেশে অনার্য্য সংশ্রবে বৈষম্যের রেখা পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। আদিম নিবাসিগণ নিরন্তর উৎপীড়ন করায় তাঁহাদিগের অন্তরে অনার্য্য-বিদ্বেষ অতিগাঢ়তর ভাব ধারণ করিয়াছিল। ঋগ্বেদের সমস্ত স্তোত্রগুলিতেই এই ভাব দেদীপ্যমান। যখন তাঁহারা তমসাচ্ছন্ন নিশির কোলে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত থাকিতেন তখন অনার্য্যেরা আসিয়া তাঁহাদিগের অতি আদরের গোধন সকল লুট্ করিয়া লইয়া যাইত এবং তাহাদিগের স্ত্রীপুত্রাদি কাড়িয়া

লইয়া গিয়া তাহাদিগের মাংস ভক্ষণ করিত এই জন্ত তাঁহারা ঋগ্বেদে অনার্য্যদিগকে দস্যু, নরভুক্, রাক্ষসাদি নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। এই দস্যুগণের উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্ত তাঁহারা রজনীতে গড়খাই করা শিবির মধ্যে একত্র বাস করিতেন। তাঁহারা সংখ্যায় এত কম ছিলেন যে, দৈববল দ্বারা আত্মবল সঞ্চয় করা একান্ত আবশুক মনে করিয়াছিলেন। দৈনন্দিন কার্য্য সমাপ্ত করিয়া যখন রজনীতে সকলে একত্রিত হইতেন তখন তাঁহারা দেবগণের স্তোত্র আরম্ভ করিতেন। এক এক জন আপন আপন হৃদয়ের ভাব কবিতাকারে প্রকাশ করিয়া সমবেত স্ত্রী-পুরুষ-মণ্ডলীর হৃদয় আকৃষ্ট করিতেন। কেহ কেহ আপন আপন হৃদয়ের ভাব কবিতাকারে গাঁথিয়া তানলয় যোগে গান করিয়া সেই ক্ষুদ্র আর্য্যজগৎকে মাতাইতেন, নির্ব্বাণোন্মুখ বীর্য্য বহ্নিতে প্রতিদিন ইন্ধন সংযোগ করিতেন। এই সকল স্তোত্র আদিকবিগণের স্বভাবজ কবিত্ব, এবং সরলতা ও জীবন্ত ধর্ম্ম-বিশ্বাস পরিব্যক্ত। ইহাতে তাঁহারা দেবগণকে পরিচিত বন্ধু ভাবে আবাহন করিয়াছেন; এরূপ ভাবে আহ্বান করিয়াছেন, যেন তাঁহারা সর্ব্বদা দেবগণের সাক্ষাৎকার লাভ পাইতেন, যেন বিপৎকালে তাঁহারা আসিয়া সাহায্য করিতেন। এই কবিত্বপূর্ণ স্তোত্র নিশ্চয় বহুকাল হইতে শিষ্য পরম্পরায় গীত হইয়া আসিতেছিল। এই জন্ত তৎকালে ইহার নাম হইয়াছিল শ্রুতি। অবশেষে ব্রহ্মর্ষি বেদব্যাস সংহিতাকারে সেগুলি প্রকাশ করেন। ঋগ্বেদ বেদব্যাস সংগৃহীত এই স্তোত্রপরম্পরা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই ঋগ্বেদের কোন

স্থানেই আধুনিক বর্ণবৈষম্যের উল্লেখ নাই। সামবেদে এই ঋক্‌গুলি গীতাকারে পরিণত হইয়াছে মাত্র; সুতরাং তাহাতেও বর্ণ-বৈষম্যের উল্লেখ থাকিতে পারেনা। যজুর্ব্বেদও ঋক বেদের সার সংগ্রহ মাত্র, অধিকন্তু তাহাতে কতকগুলি মন্ত্র সংযোজিত হইয়াছে মাত্র! ইহাতে বর্ণ-বৈষম্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়না। ব্রহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণের উল্লেখ সর্ব্ব প্রথমে কেবল ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ব্রাহ্মণগুলিতে তৎকালীন সমাজের চিত্র প্রতিফলিত ছিল ইহা যে বৈদিক কালের অনেক পরে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ বেদে যাযাবর জাতির ছবি চিত্রিত আছে। আর্য্যেরা তখন ভারতে নূতন আসিয়াছেন। সুতরাং বেদে গ্রাম নগরীর উল্লেখ নাই। শিল্প বিজ্ঞানের কথা নাই, রাজপ্রাসাদ ও পরিচ্ছদাদির উল্লেখ নাই। যাযাবর জাতির যাহা যাহা প্রয়োজন, কেবল সেই সকলের নাম আছে মাত্র, তখনও সমাজবন্ধন আরম্ভ হয় নাই। আর্য্যেরা বংশ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এরূপ ভাবে ভ্রাম্যমান জীবন নির্ব্বাহ অশান্তিপূর্ণ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের গোধনও ক্রমে কমিয়া আসিতে লাগিল। কারণ গোমাংসই সেই সময়ে আর্য্যদিগের প্রধান খাদ্য ছিল। গোমেধ-যজ্ঞের এই সময় বিশেষ আধিক্য ছিল। অতিথি আসিলেই তাহার জন্য একটী গরু মারা হইত; এই জন্য তাহাদিগকে 'গোঘ্ন' বলা হইত (*গোঘ্ন' অর্থাৎ যাহার জন্য গোবধ করা হয়)। ক্রমে আর্য্যগণের বংশ বৃদ্ধির সহিত আর গো মাংসে ও গো দুগ্ধে কুলাইয়া উঠিত না। সুতরাং কৃষির আবশ্যকতা হইয়া উঠিল। কৃষির আবশ্যকতা হওং

য়ায় কর্ষণোপযোগী ভূমির চতুষ্পার্শে তাঁহাদিগকে পল্লীবদ্ধ হইতে হইল। বিশেষতঃ অনার্য্যদিগের হস্ত হইতে গোধন ও অন্যান্যসম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য একত্র হইয়া বসবাসের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিলেন। যাযাবর অবস্থায় তাঁহাদিগকে সকলকেই প্রয়োজনানুসারে সকল কার্য্যই করিতে হইত, সুতরাং তখন কার্য্য ভেদে বর্ণ-ভেদের উৎপত্তি হয় নাই। এত দিনে কার্য্য সৌকর্য্যার্থে তাঁহাদিগের শ্রম-বিভাগ করা আবশ্যক বলিয়া বোধ হইল। তাঁহারা দেখিলেন, সকলেই যুদ্ধ করিতে গেলে সংসার ধর্ম্ম চলেনা এবং সকলে কৃষি কার্য্যে লিপ্ত থাকিলেও আত্ম রক্ষা হয় না। বিশেষতঃ সকলে সকল কাজে কিছু পটু হইতে পারে না। এই জন্য যে, যে কার্য্যের উপযোগী, তাহারই উপর সেই কার্য্যের ভার অর্পন করা হইল। যাঁহারা কৃষি কার্য্যের উপযোগী তাঁহাদিগের উপর কৃষিকার্য্যের ভার অর্পন করা হইল। ইঁহারা বৈশ্য বা বিশ নামে অভিহিত হইলেন। যাহারা যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ ও বলশালী ছিলেন তাঁহারা রাজ্য রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন।

ইঁহারা বৈশ্যদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন বলিয়া ইঁহাদিগকে 'বিশপতি' বলা হইত। ইঁহাদিগের অপর নাম ক্ষত্রিয়। আর্য্যদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস যে অতিশয় প্রবল ছিল ইহার জীবন্ত ও জলন্ত নিদর্শন ভূরি ভূরি পওয়া যায়। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে পারিলেই দেবতারা আসিয়া তাঁহাদিগের সমস্ত অভাব মোচন করিয়া দিবেন; তাঁহাদিগকে সমস্ত বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন। যখন তাঁহারা শত্রুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতেন, তখন উচ্চৈঃস্বরে এইরূপে ডাকিতেন:—

"ইন্দ্র ও সোম! আমাদিগের শত্রুগণকে বিনষ্ট কর, তাহা-

দিগকে নরকে নিক্ষিপ্ত কর! শ্বাসরোধ করিয়া তাহাদিগকে মারিয়া ফেল! ঐ উন্মত্তদিগকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড কর! ঐ নরভুক-দিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দূরে নিক্ষিপ্ত কর!" শত্রু পরিবেষ্টিত আর্য্যের হৃদয় হইতে কতই এইরূপ প্রার্থনা বাহির হইত। আর্য্যেরা যে সময় শীতপ্রধান দেশে বাস করিতেন, তখন তাঁহাদের অগ্নি ও সূর্য্যকেই প্রধান দেবতা বলিয়া প্রতীতি ছিল এবং তাঁহাদেরই উপাসনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। আবার যখন গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন, তখন আবার বায়ু ও জলকেই দেবতা বলিয়া ধারণা জন্মে এবং তাঁহাদেরও উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। ঋষিগণ চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, জল ও বায়ুতে ব্রহ্মশক্তি অনুভব করিয়াছিলেন, কেননা ইহাদের সাহায্যেই সৃষ্টি কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। এবং তাঁহাদিগের আরাধনায় দেবতারা সন্তুষ্ট হইয়া অভিষ্ট সিদ্ধ করেন, তাহা তাঁহাদিগের স্তোত্রের একাগ্রতার দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হয়। এই একাগ্রতা ঋগ্বেদের অনেক স্তোত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়, দুই একটীর ছবি আমরা দিতেছি :—"হে বরুণ! আমার স্তব শ্রবণ কর, আমি তোমার সাহায্য ভিখারী হইয়া ডাকিতেছি, আমায় সাহায্য কর, আমায় আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি সুখী হই! হে মরুদ্গণ! যাহারা আমাদিগকে উপহাস করে, যাহারা ব্রাহ্মণের দ্বেষ করে তাহা-দিগকে পুড়াইয়া মার"। যাঁহাদিগের হৃদয়ে এরূপ ধর্ম্ম বিশ্বাস এরূপ জীবন্ত ধর্ম্মভাব তাঁহাদিগের মধ্যে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সম্পন্ন ব্যক্তির আদর যে অধিক হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং যাঁহাদের অধিকতর ধর্ম্মভাব ও উজ্জ্বলতর কবিত্বশক্তি ছিল তাঁহাদিগের প্রতি অধিকাংশেরই মন ভক্তিভরে আকৃষ্ট

হইতে লাগিল। আর্য্যসাধারণ তাঁহাদিগকে অন্য কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া দেবারাধনায় নিযুক্ত করিলেন। ইঁহারাই ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মোপাসক) নামে অভিহিত হইলেন *। সেই সময় বৈশ্যেরা কৃষক ও সৈনিকের কার্য্য করিতেন। ক্ষত্রিয়েরা সেনাপতি ও রাজার কার্য্য করিতেন; এবং ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্ম-যাজক বা আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। আর্য্য-সেনা যখন শত্রু-সেনার বিরুদ্ধে অভি-যানোদ্যত হইত, তখন আচার্য্যগণ উচ্চৈঃস্বরে দেবতাদিগকে ডাকিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। আচার্য্য দেবতাগণকে আহ্বান করিয়াছেন, সুতরাং অবশ্য তাঁহারা সমরে তাঁহাদিগের সাহায্য করিবেন, এই দৃঢ় বিশ্বাসে আর্য্যসেনা সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন।

সে বিশ্বাসপ্রদীপ্ত হৃদয়ের গতি রোধ করে কাহার সাধ্য? অনার্য্য জাতি এই প্রচণ্ড আর্য্যসৈন্যস্রোত বাহিনীর সহিত অবিরত সংঘর্ষে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমে উহাতে বিলীন হইয়া গেল। যাহারা মিশিলনা তাহারা পর্ব্বতের অধিত্যকা প্রদেশে গিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিল। সাঁওতাল, ভীল প্রভৃতি পার্ব্বতীয় জাতি—সেই অদমিত ও দুর্দ্দমনীয় অনার্য্য জাতি। তাহারা সমস্ত ছাড়িল, তথাপি স্বাধীনতা বিক্রয় করিল না। এই পার্ব্বত্য জাতিসকলের অভ্য-ন্তরে আজও সেই দুর্দ্দমনীয় স্বাধীনতা স্পৃহা বর্ত্তমান। আজও তাহারা সুযোগ পাইলেই স্বাধীনতা পতাকা উড্ডীন করিয়া থাকে। সাঁওতাল-বিদ্রোহ ও রম্পা-বিদ্রোহ প্রভৃতি তাহার প্রমাণ। যে

---

* ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসিদ্বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ
ঊরু তদস্য যদ্বৈশ্য পদ্ভ্যাম্ শূদ্র অজায়ত।

সকল অনার্য্য যুদ্ধে পরাভূত হইয়া অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল, আর্য্যেরা তাহাদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন ও চতুর্থ বর্ণরূপে গ্রহণ করিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই চতুর্থ বর্ণের নাম শূদ্রবর্ণ। এইরূপে চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি হইল। এতদিনে ভারতে শক্তি বিয়োজিত হইল।

আর্য্য ও অনার্য্যে মধ্যে যে নিরন্তর সংঘর্ষ চলিতেছিল, তাহা মিটিয়া গিয়া আভ্যন্তরীণ উন্নতির সূত্রপাত হইল। আবার নূতন করিয়া কার্য্য বিভাগ হইল, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায়, রহিল। কিন্তু বৈশ্য ও শূদ্রের কার্য্যের পরিবর্ত্তন হইল। এতদিন বৈশ্যগণকে যুদ্ধের সময় সৈন্যের কার্য্য ও রসদ ক্রয় ও বাহকের কার্য্য এবং শান্তির সময় কৃষি কার্য্য করিতে হইত; কিন্তু এক্ষণে তাঁহাদিগের স্কন্ধে আর সে ভার রাখিবার আবশ্যকতা রহিল না। অসংখ্য শূদ্র হিন্দুসমাজ ভুক্ত হওয়ায় তাহাদিগের উপরই এই ভার ন্যস্ত করিয়া বৈশ্যেরা এক্ষণে বাণিজ্যবিষয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। আর্য্য-অনার্য্য মিলনের পূর্ব্বে কমিসেরিয়েট বিভাগও বৈশ্যগণের হস্তে ছিল। সেই সময় হইতেই তাঁহারা ক্রয় বিক্রয়ে পারদর্শী হইয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহারা বহির্বাণিজ্যে অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিলেন একদিন এমন গিয়াছে যে, বৈশ্যগণের বহির্বাণিজ্যপোত রোম, ভিনিস, মিসর, সিংহল, জাবা, চীন ও জাপান প্রভৃতি বন্দরে গমনাগমন করিত এদিকে শূদ্রজাতি কৃষিকার্য্যের উন্নতি ও পরিপুষ্টিতে রত রহিলেন। এই শান্তির সময়েই ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগের অধিকার সমস্ত অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বেদের শাখা প্রশাখা করিতে লাগিলেন। শ্যেন-যাগ করিলে শত্রু নাশ ও পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ করিলে পুত্র লাভ হয়, ঋষিরা স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য বেদে

এইরূপ নানা কল্পিত যাগ-যজ্ঞের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়াই ক্ষত্রিয় রাজারা ভ্রমান্ধ হইয়া যজ্ঞোপলক্ষে রাশি রাশি অর্থ অকাতরে ব্যয় করিতেন। সুচতুর ব্রাহ্মণেরা তদ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ঋষিরা চতুরতা করিয়া বেদের কর্ম্মকাণ্ডে এই রূপ নানা কাম্য কর্ম্মের কথা লিপিবদ্ধ করায় বেদের কলেবর এত বর্দ্ধিত হইয়াছে। এদেশের স্বল্পজ্ঞানী ব্রাহ্মণেরা কিন্তু একথা স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন, বেদ অপৌরুষেয় নিত্য, বেদ সৃষ্টির পূর্ব্বেও ছিল, পরেও থাকিবে, কোনও কালেই উহার উৎপত্তি বা বিনাশ নাই। কিন্তু এসমস্ত কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, কেননা বেদ যে একজনের সৃষ্টি নয়, ও এক দিনেও লিখিত হয় নাই তাহা বেদ পাঠ করিলেই সহজে বুঝাযায়। যাহা হউক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এই বেদই যে হিন্দুর আদিম ধর্ম্ম-গ্রন্থ, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। ঋষিরা বেদের পর দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও বহু ধর্ম্ম-গ্রন্থ এই সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। এই সংস্কৃত ভাষা যে অতি প্রাচীন ও অতি উৎকৃষ্ট তাহা সর্ব্বজাতীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন; যেহেতু বেদের তুল্য প্রাচীন গ্রন্থ পৃথিবীর কোনও দেশেই দৃষ্ট হয় না।

আর্য্যেরা প্রথমতঃ আপনাদিগকে শ্বেত ও এদেশের আদিম অধিবাসী অনার্য্যদিগকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন; পরে অনার্য্যদিগকেও যখন সমাজ ভুক্ত করিলেন তখন সমগ্র আর্য্যজাতিকে প্রধান চারিবর্ণে বিভক্ত করিলেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ ও শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ এবং তখনই—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যকঃ কৃতঃ।
ঊরু তদস্য যদ্বৈশ্য পদ্ভ্যাম্ শূদ্র অজায়তঃ।

এই শ্লোকের সৃষ্টি হইয়াছিল ইহার অর্থ এই যে, সৃষ্টি কর্ত্তার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, এবং পদ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে সৃষ্টি কর্ত্তার অঙ্গবিশেষ হইতে এই অনৈসর্গিক উপায়ে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের উৎপত্তি একবারে অসম্ভব; ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, ব্রাহ্মণ জ্ঞানের আলোচনা করিতেন, জ্ঞানের আলোচনা মুখের সাহায্যেই হইয়া থাকে, এইজন্য মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, আর যুদ্ধ কার্য্য বাহুর সাহায্যে হইয়া থাকে এই জন্য বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, আর বাণিজ্যার্থে বিদেশে গমন উরুর সাহায্যে হইয়া থাকে, এই জন্য উরু হইতে বৈশ্য, আর উপরোক্ত বর্ণত্রয়ের সেবাকারী বলিয়া, পদ হইতে শূদ্র এইরূপে কথাটা রূপকালঙ্কারে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে; কিন্তু লোকে তাহার প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া বিকৃত অর্থ প্রকাশ করে। যাহা হউক, প্রথমত সমস্ত মনুষ্যের সমাহারকেই মানবজাতি বলা হইত। পরে দেশ ভেদে, বর্ণ ভেদে ও আকৃতিগত বৈষম্যে ও কার্য্যের দ্বারায় জাতিবিভাগ হইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থে ইহার বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়। হিন্দুরা যেমন তাঁহাদের গ্রন্থে শ্বেত, রক্ত, পীত, ও কৃষ্ণ এই চতুর্ব্বর্ণের মনুষ্য নির্ণয় করিয়াছেন; য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরাও ককেশীয়, ইথিওপীয়, মঙ্গোলীয় এই তিন প্রধান বর্ণ ও এই তিন বর্ণের পরস্পর সংমিশ্রণে অন্যান্য বর্ণের লোকের উৎপত্তি হইয়াছে এইরূপ বলিয়া থাকেন। ভারতবর্ষেও মূল চতুর্ব্বর্ণের পরস্পর সংমিশ্রণে অন্যান্য বর্ণের লোক অর্থাৎ শঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, এবং স্ব স্ব পেশা

হিসাবে যে তাহাদের মধ্যে জাতিবিভাগ হইয়াছে তাহাও স্থানান্তরে বর্ণন করিব। আর্য্যদিগের কোনও প্রাচীন গ্রন্থে হিন্দু শব্দ নাই ; কেবল মুসলমানদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রে হিন্দু শব্দ পাওয়া যায়। কাজেই হিন্দু শব্দ যে আধুনিক তদ্বিষয়ে নিঃসন্দেহ। তবে আজ কাল হিন্দু শব্দ যখন অগৌরবের কথা নহে তখন আর হিন্দু শব্দ প্রয়োগ করায় দোষ কি? আমিও 'ভারতীয় আর্য্যদিগকে হিন্দু শব্দেই অভিহিত করিব।

—:*:—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এই হিন্দুজাতির শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণেরাই এদেশে এক মাত্র জ্ঞানচর্চ্চার অধিকার পাইয়াছিলেন। ইহারাই দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ ইত্যাদি সমস্ত বিদ্যার সৃষ্টি কর্ত্তা ইহারাই জ্ঞানার্জ্জনী বিদ্যা ও নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রচারক, এবং ইহারাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। যে, যে কোনও বিষয় শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করুক তাঁহাকে ব্রাহ্মণের নিকট আসিতে হইত। সেই জন্যই বোধ হয় 'বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরু' এই কথার উৎপত্তি হইয়াছিল। এক্ষণে যে সমস্ত ইউরোপীয় জাতি জগতের ভূষণ স্বরূপ হইয়াছেন, তাঁহারাই এক দিন ভারতীয় আর্য্যদিগকে শিক্ষা গুরু পদে বরণ করিয়াছিলেন। সভ্যতার বীজ প্রথমে এই দেশেই অঙ্কুরিত হইয়াছিল। ঋষিরা সাগর সমান বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া পার্থিব সুখ সম্পদ অনিত্য ও অকিঞ্চিৎকর বোধে ক্ষত্রিয়কে রাজ কার্য্যে ও বৈশ্য জাতিকে

কৃষি শিল্প বাণিজ্যে ব্যাপৃত রাখিয়া নিজেরা শান্তির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সর্ব্ব প্রকার অভাব ক্ষত্রিয় রাজারাই পূরণ করিতেন। কিন্তু বিবাদ মিটিয়া গেলে ব্রাহ্মণের আধিপত্য স্বতই কমিয়া আসিল। যখন সকলেই প্রাণভয়ে আকুল ছিলেন, যখন সৈন্যগণ বিশ্বাস করিতেন যে, ঋষিবৃন্দের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণ রণস্থলে তাঁহাদিগের শরীরে আবির্ভূত হইতেন এবং সেই বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত হইয়া তাহারা রণে অজেয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেই জীবন-মৃত্যু সংশয় কালে ঋক্-প্রণেতা ব্রহ্মর্ষিগণের বড় আদর ছিল। শুদ্ধ সৈন্যগণের কেন, আর্য্য-জাতি-সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, দেবতারা সহায় না হইলে, যুদ্ধে জয় লাভ হয় না; এবং ব্রহ্মর্ষিগণের স্তোত্র ভিন্ন আর কিছুতেই দেবগণ সন্তুষ্ট হন না; সুতরাং যতদিন যুদ্ধ চলিয়াছিল, ততদিন ব্রাহ্মণের আদরের আর সীমা ছিল না। এ বিশ্বাস ব্রাহ্মণেরা আপনারাও করিতেন। ব্রাহ্মণেরাও বিশ্বাস করিতেন যে, তাঁহাদিগের আরাধনায় দেবতারা তুষ্ট হইয়া অভীষ্ট সিদ্ধ করেন; কিন্তু তাঁহাদের এ আধিপত্য চিরদিন অক্ষুণ্ণ রহিল না, যখন শত্রু দমন হওয়ায় আর্য্যবর্ত্তে শান্তি বিরাজিত হইল, তখন ব্রাহ্মণগণের আধিপত্য ক্ষত্রিয়দিগের অসহ্য হইয়া উঠিল। এদিকে ব্রাহ্মণেরাও অভ্যস্ত আদরে বঞ্চিত হইয়া তুষানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। এই ব্রহ্মদ্বিট্ যে ক্ষত্রিয় তাহার আর সন্দেহ নাই; কারণ এই সময় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্ম বিষয়ে একাধিপত্যের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন। তিনি ঘোরতর তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার ও তদ্বংশীয়গণের অনেকগুলি স্তোত্র ঋগ্বেদসংহিতায় সংগৃহীত

হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে পরাস্ত হইয়া অগত্যা তাঁহাকে স্বদলভুক্ত করিয়া লইলেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে লইলেন না। তাঁহাকে মহর্ষি উপাধি দিয়া ভুলাইলেন। স্পষ্ট ব্রাহ্মণ বলিলেন না। ব্রাহ্মণেরা আর এক জন ক্ষত্রিয়ের আধ্যাত্মিক উন্নতিতে ভীত হইয়া তাঁহাকে রাজর্ষি উপাধি দিয়া ভুলাইলেন। এরূপ কথিত আছে যে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও বিদেহ-রাজ সুপ্রসিদ্ধ জনকের নিকট শাস্ত্র-জ্ঞানে পরাস্ত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা জনকের নিকট পরাস্ত হইয়াও তাঁহাকে রাজর্ষি মাত্র উপাধি দিয়াছিলেন। আধ্যাত্মিক উন্নতিতে ক্ষত্রিয়েরা যে ব্রাহ্মণগণের সমকক্ষতা লাভ করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং ব্রাহ্মণেরাও যে তাহাতে বাধা প্রদান করিতে ত্রুটী করেন নাই, তাহার অনেক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। ক্ষত্রিয়গণের যাহাতে ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তির ভাব প্রবল হয়, যাহাতে তাঁহারা ব্রাহ্মণপূজাকে দেবাদিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করেন, সেই জন্য ব্রাহ্মণেরা ঋগ্বেদের স্তোত্রের মধ্যেও সেরূপ নীতিশিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। বেদকে আর্য্যজাতির সকলেই ধ্রুব বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, “সুতরাং বেদের আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করিলে নরকে যাইতে হইবে” এই ভয়ে ক্ষত্রিয়েরা ইহার বিরুদ্ধাচারণ করিতে নিবৃত্ত থাকিবেন এই উদ্দেশেই বোধ হয় এইরূপ স্তোত্রগুলি রচিত হয়। ঋগ্বেদের ৪।৫০।৮ সূক্ত পাঠ করিলেই আমাদের কথা বুঝিতে পারিবেন। তাহার মর্ম্ম এই, যে রাজা পুরোহিতকে পুরোবর্ত্তী করিয়া চলেন, তিনি স্বরাজ্যে ও স্বগৃহে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকেন, তাঁহার মেদিনী শস্যশালিনী হয়, তাঁহার প্রজারা তাঁহার বশ্যতা

স্বীকার করে। যে রাজা শরণাগত ব্রাহ্মণকে ধন-সম্পত্তি দিয়া রক্ষা করেন, তিনি অবাধে শত্রু-মিত্রের ধনভাণ্ডার হস্তগত করিতে পারেন, ঈশ্বর তাঁহাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করেন। ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়গণকে শুধু এইরূপে ভুলাইয়া ক্ষান্ত রহিলেন এরূপ নহে, তাহাদিগের উন্নতির পথে অনেকগুলি কণ্টক রোপণ করিয়া রাখিলেন। বেদের স্তোত্রগুলির উচ্চারণের নিয়ম এরূপসূক্ষ্ম করিলেন যে, যাঁহারা আশৈশব তাহার উচ্চারণ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা ব্যতীত আর কেহ তাহা সহজে উচ্চারণ করিয়া উঠিতে পারে না। এ দিকে তাঁহারা লোকের মনে এরূপ সংস্কার জন্মাইয়া দিতে লাগিলেন যে, বেদের শব্দের বা বর্ণের উচ্চারণের ঈষৎ তারতম্য হইলেও দেবতারা রুষ্ট হ'ন। সুতরাং কার্য্যতঃ আশৈশব বেদগাতা ব্রাহ্মণ ব্যতীত বেদের উচ্চারণে আর কাহারও অধিকার থাকিল না। অগত্যা জন-সাধারণের বেদ-চতুষ্টয়-বিধানের নিমিত্ত ব্রাহ্মণ-বর্ণের শরণাপন্ন হইতে হইত। এইরূপে লোক-শিক্ষায়, যজনকার্য্যে ও রাজোপদেশে ব্রাহ্মণের একাধিপত্য রহিয়া গেল। যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ স্তব না করিলে, ইন্দ্রাদি দেবতা প্রসন্ন হন না; ইন্দ্রাদি দেবতা প্রসন্ন না হইলে সৈন্যের মনে বিজয়াশা জন্মে না, সৈন্য আশাপ্রদীপ্ত না হইলেও বিজয়লক্ষ্মী রাজার অঙ্কশায়িনী হন না, সুতরাং রাজাকে ব্রাহ্মণ-চরণে লুণ্ঠিত-শির ও ব্রাহ্মণের অনুগ্রহপ্রার্থী দেখিয়া প্রজারাও রাজগুরু ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হইত। রাজা প্রজা সকলেই ব্রহ্মশাপের ভয়ে অস্থির। ব্রাহ্মণকে যে কোনও প্রকারে প্রসন্ন করিতে পারিলেই দেবতারা প্রসন্ন হইবেন সকলেরই এই বিশ্বাস। এদিকে ব্রাহ্মণেরাও এই বিশ্বজনীন বিশ্বাসের সুবিধা লইতেও ত্রুটী করেন

নাই। তিনি আপনাকে দেবোপাসক হইতে ক্রমে উচ্চতর পদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন, ক্রমে তিনি আপনাকে 'মনুষ্য দেব' বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। বৈদিকযুগে শ্রাদ্ধ ততদূর গড়ায় নাই। 'ব্রাহ্মণ' যুগেই দেবপূজক ব্রহ্মন্ স্বয়ং দেব-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। শতপথ ব্রাহ্মণে (২য় অ।২।৬) লিখিত আছে যে, দুই শ্রেণীর দেবতা আছেন। প্রথমতঃ স্বর্গীয় দেবগণ, দ্বিতীয়তঃ মনুষ্য-দেবগণ। যাঁহারা সমগ্র বেদ পাঠ করিয়াছেন ও বেদের প্রকৃত উচ্চারণে সমর্থ, তাঁহারাই মনুষ্যরূপী দেবতা। এই দুই দেবতার পূজাব্যতীত মানবের মুক্তি নাই। ওদিকে ব্রাহ্মণেরা প্রথমে যে মাহাত্ম, নৈতিক উৎকর্ষ, ও জলন্ত বিশ্বাসে আর সকলকে মুগ্ধ করিয়া আপনাদিগের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, ক্রমশঃ তাঁহাদিগের সে মাহাত্ম্য, নৈতিক-উৎকর্ষ ও জলন্ত বিশ্বাসের অভাব ঘটিতে লাগিল; সুতরাং আপনাদিগের আধিপত্য রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণগণকে আধিদৈবিক উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদিগের প্রাথমিক স্তোত্র পরম্পরায় স্বার্থের প্রতিবিম্ব পতিত হয় নাই। তখন তাঁহারা একমাত্র বর্ণ ব্যতীত আর্য্যদিগের মধ্যে দ্বিতীয় বর্ণ জানিতেন না। তখন নিঃস্বার্থ স্বজাতি-প্রেম তাঁহাদিগের কার্য্যের একমাত্র নিয়ামক ছিল। সে সত্য যুগের কথা এখন ব্রাহ্মণ ভুলিয়া গিয়াছেন। ভাগবত-পুরাণে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে যে, 'সত্য যুগে একমাত্র বেদ, একমাত্র দেবতা, একমাত্র অগ্নি ও একমাত্র বর্ণ ছিল।'

ত্রেতা যুগে পুরুরবার সময়েই তিন বেদ ও তিন বর্ণ হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও এই বর্ণগত ভেদের উৎপত্তির বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ লিখিত আছে যে, সর্ব্ব প্রথমে

একমাত্র 'ব্রহ্ম' ছিলেন। তাঁহা হইতেই দেব মানবের সৃষ্টি হইয়াছে। মানব-সৃষ্টির প্রথম সৃষ্টি ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় সৃষ্টি ক্ষত্রিয়, তৃতীয় সৃষ্টি বৈশ্য, চতুর্থ সৃষ্টি শূদ্র। শূদ্রকে পৃথিবী বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। (অর্থাৎ ধরিত্রী যেমন সর্ব্বভূতের ভর্ত্রী, সেইরূপ শূদ্র জাতি সকল বর্ণেরই আহার দাত্রী)।

ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের গুরু। যে পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে ঘৃণা করিবে, তাহাকে গুরুবধের পাতকী হইতে হইবে। এই সকল উক্তি দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ব্রাহ্মণেরা এই কালে শাস্ত্রের ভয় প্রদর্শন দ্বারা ভক্তি চিরস্থায়িনী করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। যদি গুণ থাকে ত ভক্তি আপনিই আসিবে, এ বিশ্বাসের উপর তাঁহারা নির্ভর করিয়া থাকিতে সাহস করেন নাই। যখন পর-লোকের ভয় দেখাইয়াও কুলাইল না, তখন তাঁহারা অভিশাপের ভয় দেখাইতেও পরাঙ্মুখ হন নাই। এই স্বধর্ম্মচ্যুতি রূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত, তাঁহারা হাতে হাতে পাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-গণের এই একাধিপত্য-প্রিয়তার জন্য ক্ষত্রিয়গণের সহিত তাঁহাদিগের ঘোরতর শত্রুতা বাধিয়া উঠিল। ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্ম-ণের এরূপ একাধিপত্য অস্বীকার করিলেন। অনেক রক্তা-রক্তির কথা ব্রাহ্মণ ও পুরাণাদিতে লিখিত আছে। আমরা এখানে দুই একটী মাত্রের উল্লেখ করিব। ক্ষত্রিয়েরাই প্রথম এই সংঘর্ষ উপস্থাপিত করেন। ভৃগুবংশীয়েরা কার্ত্তবীর্য্যের পুরোহিত ছিলেন। কার্ত্তবীর্য্য তাঁহাদিগকে অনেক অর্থ দিয়া যান। তাঁহাদিগের অনেকেই দানাদি দ্বারা সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, কেহ কেহ তাহা বিল মধ্যে লুকায়িত রাখিয়া ছিলেন। কার্ত্তবীর্য্যের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ

নিঃস্ব হইয়া পড়েন। তাঁহারা সমস্তই জানিতেন এবং ভৃগু-বংশীয়গণের নিকট কিছু ধন চাহেন, কিন্তু কিছুনা পাইয়া শেষে তাঁহাদের বাটীর মাটী খুঁড়িতে লাগিলেন। খুঁড়িতে খুঁড়িতে সেই গুপ্তধন বাহির হইয়া পড়িল। তখন তাঁহারা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া ভৃগুবংশের আবালবৃদ্ধবনিতা, অধিক কি গর্ভস্থ শিশু সন্তান পর্য্যন্ত মারিয়া ফেলিয়া ছিলেন। কেবল দৈববলে দুই একটী রক্ষা পাইয়াছিল। পরশুরাম তাহার অন্ততম। পরশুরাম ভৃগকুল-তিলক জমদগ্নির পুত্র। সেই বীরের হৃদয়ে আশৈশব দুর্দ্দমনীয় প্রতিহিংসা বৃত্তি উদ্দীপিত হয়। যথাকালে তিনি পিতৃকুলের উচ্ছেদের প্রতিশোধ লইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার ন্যায় বীর তৎকালে জন্মে নাই। তাঁহার প্রচণ্ড কুঠারাঘাতে ক্ষত্রিয় কুল নির্ম্মূল হইতে লাগিল। শুনিলে হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায় যে, তিনি একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া সামন্ত পঞ্চকে পাঁচটী রৌধির-হ্রদ প্রস্তুত করিয়া সেই শত্রু-শোণিতে পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন। পরশুরাম নিজে পরম যোগী ছিলেন। এ নরহত্যায় এ স্বজাতি ধ্বংসে তাঁহার প্রতিহিংসা সাধন ভিন্ন অন্য কোন স্বার্থ সাধনের ইচ্ছা ছিল না। তিনি এইরূপে ভারতভূমিকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া তাহাতে ব্রাহ্মণের আধিঃপত্য পুনঃস্থাপিত করিয়া কাশ্যপ মুনির হস্তে সমস্ত ভারত-সাম্রাজ্য অর্পণপূর্ব্বক, মহেন্দ্র পর্ব্বতের উপত্যকা ভূমিতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। জমদগ্নির মাতা সত্যবতী কাণ্যকুজাধিরাজ কুশিক বংশোদ্ভব গাধির কন্যা। এই গাধির পুত্রেরই নাম প্রখ্যাতকীর্ত্তি বিশ্বামিত্র। সুতরাং পরশুরাম বিশ্বামিত্রের ভাগিনেয় পুত্র। পরস্পর এত নিকট সম্বন্ধযুক্ত হইয়াও দুইজনে

দুই প্রতিকূলদিকে ধাবিত হইয়াছিলেন। পরশুরাম ক্ষত্রিয়ের ধ্বংসে কৃতসংকল্প, বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণের একাধিপত্যনাশে গৃহীত-ব্রত। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা সুদেশের পৌরোহিত্য লইয়া বশিষ্ঠের সঙ্গে বিশ্বামিত্রের যে ঘোরতর সংগ্রাম হয়, তাহার অনেক কিংবদন্তী পুরাণাদিতে ব্যক্ত আছে। এখানে তাহার সবিস্তার বর্ণন অনাবশ্যক। এই সংঘর্ষের ফলে বিশ্বামিত্র মহর্ষি হইয়াছিলেন। বটে, কিন্তু ব্রহ্মর্ষিত্ব বা রাজপৌরোহিত্য প্রাপ্ত হন নাই। সেই-রূপ এই সংঘর্ষকালে কাশীশ্বর অজাতশত্রু যাঁহাকে কৌশীতকী ব্রাহ্মণে মহর্ষি গর্গ অপেক্ষারও অধিকতর বেদজ্ঞ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; এবং বিদেহ রাজ জনক যাঁহাকে যাজ্ঞবল্ক শত-পথ ব্রাহ্মণে আপনা অপেক্ষা অধিকতর পণ্ডিত বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তিনি রাজর্ষি উপাধি মাত্র পাইলেন, কিন্তু ব্রহ্মর্ষি উপাধি পাইলেন না। সুতরাং ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা এক প্রকার অক্ষুণ্ণ রহিয়া গেল। বরং এই বিজয়ে সেই প্রভুত্ব অধিকতর সুদৃঢ় হইল। মহাভারতে যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কথা বর্ণিত আছে, তাহা অনেকেই জানেন, এই যুদ্ধকেও কেহ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ বলিয়া থাকেন। কেন না ইহার এক পক্ষের নেতা সবান্ধব দ্রোণাচার্য্য, অপর পক্ষের নেতা সসৈন্য দ্রুপদ রাজা। দ্রুপদ রাজা ও দ্রোণাচার্য্যে যে শত্রুতা হইয়াছিল, সেই শত্রুতা হইতে এই যুদ্ধের উৎপত্তি। যাহা হউক, এই যুদ্ধ কুরু-পাঞ্চালে, কুরু-পাণ্ডবে, কি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে যাহাতেই হউক, এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভারতের যে সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে, তাহা আর কিছুতেই পূর্ণ হইবার নহে। দুরদৃষ্ট ব্যক্তি যেমন সৎকার্য্য করিলেও তাহা অসৎরূপে পরিণত হয়, এই হতভাগ্য দেশের দশাও তাহাই

ঘটিয়াছে। অনন্ত জ্ঞানী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে শন্, হুক্, যবন প্রভৃতি-যে সমস্ত পরাক্রান্ত জাতি রহিয়াছে, তাহারা কালে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে পারে। ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্যে বিভক্ত, কিন্তু যদি সমস্ত ভারতবর্ষে একটী রাজশক্তি সংস্থাপিত হয়, তাহা হইলে আর বিদেশীর আক্রমণ আশঙ্কা থাকে না। তাই তিনি যুধিষ্ঠিরকে সমগ্র ভারতের অধীশ্বর করিতে কৃতসংকল্প হইয়া রাজসূয় যজ্ঞে ব্রতী হইলেন। কেন না তৎকালে সমগ্র ভারত শাসন করিবার ক্ষমতা, একমাত্র মহারাজ যুধিষ্ঠিরেরই ছিল, শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবের সহায় বলিয়া অনেকেই যুধিষ্ঠিরের আধিপত্য স্বীকার করিল; কিন্তু মগধের রাজা জরাসন্ধ বিষম বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীকৃষ্ণ বহু চেষ্টায় তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়া রাজসূয়-যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন। তাহাতেও বিষময় ফল ফলিল, যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য্য দর্শনে দুর্য্যোধনের মনে দারুণ ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইল, এবং তাহার ফলে কুরুক্ষেত্রে ভীষণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া ভারতের ভাগ্যে শেষে তাহাই কালানল রূপে পরিণত হইল। মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারতে এই সমস্ত বিষয় বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, এবং এইযুগে তিনি বহু গ্রন্থরচনা করিয়াছেন। মহাভারত, গীতা, ভাগবত, অষ্টাদশ পুরাণ, অষ্টাদশ উপপুরাণ, উপনিষদ, সংহিতাও সমগ্র বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; কিন্তু এই কথায় অনেকেরই ঘোর আপত্তি, তাঁহারা বলেন, এত অধিক গ্রন্থ একজনের দ্বারা বিরচিত হওয়া অসম্ভব; কিন্তু আমি অসম্ভব বলিয়া মনে করি না, কেন না কলিযুগজাত দাসত্বে শৃঙ্খলাবদ্ধ অল্পায়ু মানবের রাজকুষ্মাণ্ড ও

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারা যদি এত বহুল গ্রন্থের সৃষ্টি হইতে পারে, তবে ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পক্ষে ত তাহা অসম্ভব নহে; তবে সন্দেহের কারণ এই যে, সমস্ত পুরাণ যদি এক বেদব্যাস বিরচিত হইবে, তবে এত বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয় কেন? শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম, শ্রীরাধিকার নামই নাই; আবার ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীরাধিকা আদ্যাশক্তি, শ্রীকৃষ্ণ সামান্য বালক, ইহাতেই বোধ হয় যে ঐ দুই গ্রন্থ একজনের দ্বারা রচিত হয় নাই, কিন্তু তদুত্তরেও কেহ বলেন যে সন্দেহের কারণ কিছুই নাই, ভগবান বেদব্যাস যে গ্রন্থে মধুর ভাবের উপাসনার কথা লিখিয়াছেন, সেই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আর যে গ্রন্থে মাতৃভাবের উপাসনার কথা লিখিয়াছেন, সেই গ্রন্থে শ্রীরাধিকাকে আদ্যাশক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আবার কেহ বলেন যে ব্যাস শব্দ উপাধি বিশেষ; পূর্ব্বকালে গ্রন্থকারগণ তাঁহাদের নামের পূর্ব্বে ব্যাস শব্দ প্রয়োগ করিতেন। পরন্তু একথাও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় যে, ঐ সমস্ত গ্রন্থ বেদব্যাস ও তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্য দ্বারা ক্রমশঃ রচিত হইয়াছে। শিষ্যগণ ঐ সকল গ্রন্থে আপন দের নাম না দিয়া পরমগুরু ভগবান বেদব্যাসের নামই রক্ষা করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য দুইটি, একতর নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমান রহিল না, দ্বিতীয়তঃ গ্রন্থের গুরুত্ব সংস্থাপিত হইল। আর এই সমস্ত গ্রন্থও যে মূল এক বেদ হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতেও কোনও সন্দেহ নাই। বেদ হইতে উপনিষদ, উপনিষদ হইতে সংহিতা, সংহিতা হইতে পুরাণ, পুরাণ হইতে উপপুরাণ সৃষ্ট হইয়াছে। পুরা শব্দের উত্তর নী ধাতু ড প্রত্যয় করিয়া পুরাণ

শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, অর্থ এই ; পুরাকালের ইতিবৃত্ত নিহিত থাকে যাহাতে। তবেই সিদ্ধ হইল যে কালের ঘটনা, সেকালে লিখিত হয় নাই ; তাহার বহু সহস্র বৎসর পরে লেখা হইয়াছে। যাহা হউক হিন্দুদিগের এই সমস্ত গ্রন্থ পাঠে বুঝিতে পারি যে, হিন্দু জাতি একদিন সভ্যতায় জগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন। কি রাজনীতি, কি ধর্ম্মনীতি, সমস্ত বিষয়েই হিন্দু শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন, হিন্দুর মত সমাজ-বন্ধন পৃথিবীর আর কোনও জাতির মধ্যেই ছিল না। তৎকালে বর্ণসংমিশ্রণের প্রতিকূলে কোনও কঠোর নিয়ম বিধিবদ্ধ হয় নাই। ব্রাহ্মণ সকলের অন্নই গ্রহণ করিতেন, এবং চতুর্ব্বর্ণের কন্যার পাণি গ্রহণও করিতেন, এমন কি কন্যাসম্প্রদানেও ইতস্ততঃ করেন নাই। শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক যযাতিকে কন্যা সম্প্রদানই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ক্ষত্রিয়েরাও নিম্ন জাতির কন্যা গ্রহণ করিতেন—শান্তনু কর্ত্তৃক ধীবর-কন্যার পাণিগ্রহণই তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ; এইরূপ চতুর্ব্বর্ণই পরস্পর সকলের অন্নই সকলে গ্রহণ করিতেন ও সকলেই সকলের কন্যার পাণি গ্রহণও করিতেন। নিম্নলিখিত কয়েকটী ঘটনায় তাহা আরও বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারিবেন। সেকালে একজন ব্রাহ্মণ হইলেই যে তাঁহার পুত্র-পৌত্রাদি বংশপরম্পরায় ব্রাহ্মণ হইতে থাকিবেন, এরূপ ছিল না। ব্রাহ্মণের ছেলে শূদ্রের কার্য্য করিলে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেন। আবার শূদ্রের ছেলেও ব্রাহ্মণের কার্য্য করিলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতেন, শাস্ত্রে ইহার ভূরিভূরি প্রমাণ আছে। রাজর্ষি জনক ও বিশ্বামিত্র তপোবলে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব অধম ধীবরকুলের দৌহিত্র হইয়াও পরম পবিত্র ব্রাহ্মণকুলের

শীর্ষস্থানীয় হইয়া ভগবান বেদব্যাস এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। বেশ্যাগর্ভজাত বশিষ্ঠ মুনিও পরম পবিত্র সূর্য্যবংশের কুলগুরুর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। নৈমিষারণ্যে ঘৃণিত সুতপুত্রও ব্যাসাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন। মহারথ কর্ণও ঐরূপ সুতপুত্র হইয়াও ক্ষত্রিয় সমাজে স্থান পাইয়াছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপকুলে প্রতিপালিত হইয়াও ক্ষত্রিয়সমাজ ভুক্ত হইয়াছিলেন এবং যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে স্রক চন্দন লাভ করিয়াছিলেন। সুরাসুরের উৎপত্তি আলোচনা করিলেও দেখা যায়, এক কশ্যপ প্রজাপতি হইতেই সকলের উৎপত্তি, কিন্তু তাঁহার কতকগুলি পুত্র যাহারা শান্ত, দান্ত, ও সদাচার সম্পন্ন তাহারাই

তাহারাই দেবতা, আর কতকগুলি যাহারা দুর্বৃত্ত ও কদাচারী তাহারাই দৈত্য। বিশ্বশ্রবা মুনি পরম পবিত্র ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্রগণ, রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ স্বীকৃত কর্ম্মের ফলে রাক্ষস আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন হইতে ব্রাহ্মণেরা শুদ্ধ স্বধর্ম্মাতিবেকের বিরুদ্ধে নিয়ম করিয়া ক্ষান্ত রহিলেন না; চতুর্বর্ণের পরস্পরের মধ্যে আদান ও অন্ন গ্রহণাদি নিষিদ্ধ করিলেন এবং কঠোর সামাজিক দণ্ড দ্বারা এই পার্থক্য চিরস্থায়ী করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়সকল পরশুরামের কুঠারাঘাতে প্রায় নির্ম্মূল হইয়াছিল সুতরাং ভারতের শক্তিসামঞ্জস্য নষ্ট হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের দুর্দ্দমনীয় প্রভু-শক্তিকে সংযমিত করিতে ক্ষত্রিয়কুল সম্পূর্ণরূপে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময়ই ব্রাহ্মণেরা সমগ্র আর্য্য জাতিকে যেমন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারি শ্রেণীতে

বিভক্ত করিলেন, সেইরূপ আবার মানব জীবনকেও ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চতুরাশ্রমে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন।

—:*:—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কিন্তু এইরূপ অবস্থা বহুকাল থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মণের অত্যাচার যখন একান্ত দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিল, তখনই কপিলবস্তু নগরের অধীশ্বর শুদ্ধোদনের পুত্র ক্ষত্রিয়-কুল-তিলক শাক্যসিংহ বর্ণত্রয়ের কষ্ট নিবারণার্থ কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ব্রাহ্মণ-গণের একাধিপত্য-প্রিয়তাই ভারতে শাক্যসিংহ প্রচারিত বৌদ্ধ-ধর্ম্মের আশুকৃতকার্য্যতার প্রধান কারণ। 'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ জ্ঞানী; অভেদ বুদ্ধির ভাব সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার অন্তরে উদিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি আদি বুদ্ধ বলিয়া প্রথিত। তিনি প্রচার করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সব সমান। চতুর্ব্বর্ণের নিকট তিনি এই সাম্য গান গাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ দীন দুঃখী অবহেলিত ও পদদলিত শূদ্র জাতির নিকটই তিনি এই নব ধর্ম্মের সবিশেষ প্রচার আরম্ভ করিলেন। এই গানের এমনিই মোহিনী শক্তি যে, এ গান যখন যে দেশে যিনিই গাহিয়াছেন, তিনিই জগৎকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছেন। খৃষ্ট, চৈতন্য, গুরু গোবিন্দ, শাক্য সিংহ, মহম্মদ, শঙ্কর ও শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি সকলেই এই সাম্য-ধর্ম্মের প্রচারক। প্রত্যেকেই এই নূতন গানে জগৎকে মাতাইয়া গিয়াছেন। প্রত্যেকেরই ছবি আজও জগতের কোনও কোনও স্থানে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। বৈষম্য-

বদ্ধ জগতের আজও তাহা আশাস্থল। ব্রাহ্মণ ও বেদের বিরুদ্ধেই শাক্যসিংহের অভ্যুত্থান। বৈষম্যের আকর ব্রহ্মণজাতি, এবং তাঁহাদের আধিপত্য সংরক্ষণের প্রধান দুর্গস্বরূপ বেদ, সুতরাং এই দুইই তিনি উড়াইয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি এই সুমহৎ ব্রত উদ্‌যাপনার জন্য রাজ-সিংহাসন, প্রাণময়ী ভার্য্যা, প্রাণাধিক পুত্র, স্নেহময় জনক জননী সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া অতি কঠোর সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেন, নিজে আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া তিনি জগৎকে আত্মত্যাগ শিখাইলেন। বৈষম্যপূর্ণ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রত্যেককে যে কঠোর সামাজিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, এই নব ধর্ম্মে তাহা খুলিয়া দিল। নবীন উৎসাহে ভারত মাতিয়া উঠিল। সম্রাট্ হইতে কুটীরবাসী পর্য্যন্ত সকলেই এই নব ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। বুদ্ধ শুধু পুরুষ জাতির বন্ধন খুলিয়া দিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন নাই। তিনি স্ত্রীজাতিকেও সকল বিষয়ে পুরুষের সমান অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন বৌদ্ধধর্ম্মের জয়-পতাকা লইয়া বৌদ্ধ প্রচারক ও বৌদ্ধ প্রচারিকাগণ ভারত আলোড়িত করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের প্রচার কার্য্য ভারতের সঙ্কীর্ণসীমায় আবদ্ধ রহিল না দেশ-দেশান্তরে ও দ্বীপ-দ্বীপান্তরে তাহা বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। আজ দুই একটী মুক্তি-ফৌজ দেখিয়া ভারতবাসী অবাক হইতেছে, কিন্তু কত বৌদ্ধ-মুক্তি-ফৌজ যে জগৎকে বিমুগ্ধ করিয়া বেড়াইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সেই মোহ-মন্ত্র আজও মানবজাতীর তৃতীয়াংশকে বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছে। আজও যেখানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবল, সেইখানেই জাতীয় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বর্ত্তমান। চীন জাপান প্রভৃতি তাহার

নিদর্শন। ভারতে যে ছয় সাত শত বৎসর এই ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, সেই ছয় শত বৎসরই ভারতীয় ইতিহাসের উজ্জ্বলতম কাল। ভারতের বাণিজ্য পোত, ভারতের রণতরী, ভারতের মুক্তি-ফৌজ এই সময়ই জগৎ আলোড়িত করিয়া বেড়াইয়াছিল। এই সময়ই শিল্পের চরম উন্নতি হইয়াছিল। এই সময়ই বিদ্যার বিমল-জ্যোতি সর্ব্ব শ্রেণীতে এবং স্ত্রীপুরুষ উভয় জাতিতে সমভাবে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল।

অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থকার ও গ্রন্থকর্ত্রী শূদ্র জাতি হইতে উৎপন্ন। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রভাবে ভারতের এরূপ অভ্যুদয় হইয়াছিল যে, গ্রীক-নরপতিগণ ভারতীয় নরপতিগণের নিকট সন্ধি প্রার্থী হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব কালেই ভারত সিংহল বিজয় করিয়াছিল, এবং অজেয় সেকন্দর সাহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু এই সৌভাগ্য ভারতের দুরদৃষ্টবশতঃ চিরস্থায়ী হইল না। বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারকগণ সাগর পার হইয়া এমেরিকাতেও গিয়াছিলেন এবং এখনও এসিয়াখণ্ডের অনেক দেশেই বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচলিত। কিন্তু এই সাম্য-তন্ত্ররূপ প্রকাণ্ড বিপ্লব ছয় সাত শত বৎসর মাত্র ভারতে রাজত্ব করিয়াই ব্রাহ্মণের বুদ্ধির নিকট পরাজয় স্বীকার করিল, কারণ বৌদ্ধেরা প্রথম অহিংসা সর্ব্বজীবে দয়া ও সাম্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি দ্বারা দেশের বহুতর হিত-কর কার্য্য সাধন করিয়াছিল। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়! কালক্রমে বৌদ্ধসমাজেও ব্যভিচার প্রবেশ করিল। সকলেই পাপের স্রোতে গা ঢালিয়া দিল, সকলেই স্বেচ্ছাচারী হিংসুক ও পাপপরায়ণ হইল। কাহারও মনেই ধর্ম্ম ভাবছিলনা, পরকালে বিশ্বাস ছিলনা ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করেনাই, তখন

দেশের বিষম দুর্দ্দিন। সেই সময় প্রসিদ্ধনামা শঙ্করাচার্য্যই অলৌকিক প্রতিভাবলে আর্য্য-সাম্য বায়ব্যাস্ত্রে বৌদ্ধ-সাম্যবরুণাস্ত্র উড়াইয়া দিলেন। বিষস্য "বিষমৌষধম্"বিষ দ্বারায় বিষ নষ্ট করার ন্যায় এক প্রকার সাম্য প্রচার দ্বারা অন্য প্রকার সাম্য বিলুপ্ত করিলেন। বুদ্ধ গাহিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলেই সমান।

শঙ্করাচার্য্য গাহিলেন "ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্" এক ব্রহ্মই 'সত্তং' অপর সমস্তই সত্তাভাস, প্রকৃত সত্তানহে; জড় অজড়ে সমস্তই এক ব্রহ্মময়। এই যে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ দেখিতেছ, এই সেই ব্রহ্ম বই আর কিছুই নয়। প্রকৃতি ভ্রমমাত্র। পুরুষই একমাত্র সত্তা অর্থাৎ যাহাকে তোমরা প্রকৃতি বলিতেছ তাহা প্রকৃতি নহে পুরুষ বা ব্রহ্ম—প্রকৃতি-পুরুষ ভেদ-জ্ঞান অজ্ঞানের কার্য্য। এই মহাঅস্ত্রের নিকট বৌদ্ধ অস্ত্র পরাস্ত হইল। যখন সবই এক—যখন জড়, অজড় সবই ব্রহ্ম বই আর কিছুই নহে—তখন ব্রাহ্মণও শূদ্রে, সভ্য ও অসভ্যে, দীনও দরিদ্রে স্ত্রীও পুরুষে কেন ভেদ থাকিবে? হটাৎ যেন ভারতের মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হইল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম যেন আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া চিরপালিত বৈষম্য ভুলিয়া গেল।

এই অদ্বৈতবাদ গহ্বরে বৌদ্ধ সাম্যবাদ বিলীন হইয়া গেল বৈষম্য জনিত বিবাদ যেন কোথায় চলিয়া গেল। শূদ্র, যবন, পার্ব্বত্য, বৌদ্ধ সমস্ত সাম্প্রদায়িক নদ নদী যেন এই প্রকাণ্ড অদ্বৈতবাদ মহাসাগরে আসিয়া মিশিয়া গেল। সবই এক—সুতরাং সবই সমান—এই মহামন্ত্র ভারতের সর্ব্বত্র উদ্ঘোষিত হইতে লাগিল। যে ভারতভূমি এতদিন হিন্দু-বৌদ্ধ সংঘর্ষে রুধির কর্দ্দমিত হইতেছিল; আজ তাহাতে যেন শান্তিবারি পতিত

হইল। শঙ্করাচার্য্য অসংখ্য ভাঙ্গাদল যোড়া দিয়াছিলেন—ছিন্ন ভিন্ন বিশীর্ণ ভারতকে এক করিয়াছিলেন; সকলকে পায়ে ধরিয়া ডাকিয়া এক ধর্ম্ম-মন্দিরের ভিতরে আনিয়াছিলেন। সে সময় শঙ্করাচার্য্য ভারতক্ষেত্রে প্রাদুর্ভূত না হইলে, বোধ হয় এতদিন জগতে হিন্দু ধর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইত। সেই ধর্ম্ম-বীরের মাহাত্ম্যেই হিন্দু ধর্ম্ম নবীন তেজে উঠিয়া কিছু কাল ভারতে সমস্ত সাম্প্রদায়িকতা বিলুপ্ত করে, ভারতের স্তরে স্তরে আবার হিন্দু ধর্ম্মের বীজ নিহিত হয়। কিছু কাল ধরিয়া হিন্দু ধর্ম্ম শঙ্কর মাহাত্ম্যে ভারতে অপ্রতিদ্বন্দিনী প্রভুতা ভোগ করিয়াছিল। অদ্বৈতবাদাময় সাম্যের ভেরী বহুদিন ধরিয়া ভারতের পর্ব্বতে পর্ব্বতে, গুহায় গুহায়, ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে উদ্বোধিত হইয়া ছিল। এই সময় ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্যপূর্ণ বহু গ্রন্থ রচনা করিবার সুযোগ পাইলেন। তাঁহাদের প্রধান কথা এই যে, জগতের সব দেবতার অধীন, দেবতা মন্ত্রের অধীন, মন্ত্র ব্রাহ্মণের মুখে, সুতরাং মানবের সুখ দুঃখ ইহকাল পরকাল সমস্তই ব্রাহ্মণের হাতে। ব্রাহ্মণের পাদোদক পানে পাপ নাশ, ব্যাধি নাশ, এবং পরকালেও দিব্য গতি এই কথাই সমস্ত গ্রন্থে লিখিত হইল। জগতের সমস্ত জাতি ব্রাহ্মণের সুখের জন্য, ব্রাহ্মণের সেবার জন্য! যে ব্যক্তি বিপ্রসেবায় বঞ্চিত, তাহার জীবন বৃথা। যাহার গৃহে কখন ব্রাহ্মণের আগমন হয় নাই; তার গৃহ শ্মশান সমান। যার দেহে বিপ্রপদরজ বিলেপিত হয় নাই, তাহার দেহ কর্ম্মকারের ভস্ত্রিকা যন্ত্রের ন্যায় শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া নির্ব্বাহক যন্ত্র মাত্র। প্রতি পদেই বেদের দোহাই, কিন্তু সেই বেদ পড়িবার সা-্মণের অধিকার নাই। যদিও ক্ষত্রিয়

লাভ ইত্যাদি প্রত্যেক দেবতার পূজাতেই মানবের কোননা কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, এই সব কথা নূতন কল্পিত শাস্ত্রে লিখিত হইতে লাগিল। এদেশে দর্শন-শাস্ত্র বহুতর,তন্মধ্যে অনেক লোপ পাইয়াছে, যাহা আছে, তাহার মধ্যে সাংখ্য,পাতঞ্জল,ন্যায়,মীমাংসা,বৈশেষিক, ও বেদান্ত এই ছয়খানি প্রধান,ইহার মধ্যেও আবার সাংখ্য শাস্ত্রের আলোচনা খুব বেশী, ভগবান্ কপিল এই সাংখ্য-শাস্ত্রের প্রণেতা তিনি ইহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা দেখিলেন, সাংখ্য যখন নিরীশ্বর হইল, তখন সমস্ত দেব-দেবীর উপাসনাইত ফাঁসিয়া যায়। তখন ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা নূতনমত এই শাস্ত্রের সহিত মিলাইয়া বাহির করিলেন। সাংখ্য শাস্ত্রের মতে পুরুষ প্রকৃতি যোগে সৃষ্টি, অর্থাৎ পুরুষ জড়, প্রকৃতি ক্রিয়া শীলা, এই প্রকৃতিই স্বভাব অর্থাৎ স্বভাব জড় বস্তু লইয়া সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করিতেছে। ব্রাহ্মণেরা লিখিলেন, শিব পুরুষ, শবাকারে পড়িয়া আছেন, শক্তি তাঁহার বক্ষে দাঁড়াইয়া চার হস্তে সৃষ্টি-স্থিতি লয় করিতেছেন। রাধা-কৃষ্ণের উপাসনাও এই তত্ত্ব হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। শুধু ইহাই করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। কেমন সুন্দর করিয়া পুরাণে সৃষ্টিতত্ত্ব সাজাইয়া রাখিয়াছেন। তাহাই দেখুন নাস্তিক আস্তিক সকলকেই একথা স্বীকার করিতে হইবে যে,স্বভাব হইতেই বিশ্ব-সংসারের সৃষ্টিস্থিতি লয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। স্বভাব শব্দের অর্থ যে নিজে অবিশেষ অথচ বিশেষের আশ্রয়ের স্থল। আমরা সকলেই স্বভাবের ক্রোড়ে শায়িত, কিন্তু স্বভাব যে কি বস্তু তাহা আমরা দেখিতে পাই না। এই স্বভাবের তিনটী শক্তি, একটী উৎপাদিকা, একটী বর্দ্ধন ও অপরটী বিনাশক, স্বভাব অর্থই প্রকৃতি। ব্রাহ্মণেরা লিখিলেন,

প্রকৃতিই আদ্যাশক্তি তাঁহার তিনটীপুত্র ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর তিন-জনের তিনটীগুণ, অর্থাৎ ব্রহ্মা রজোগুণে সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু সত্বগুণে পালন করেন, ও শিব তমোগুণে নাশ করেন। এই জন্যই পুরাণে ব্রহ্মাকে উৎপাদক, বিষ্ণুকে প্রতিপালক, ও শিবকে সৃষ্টিসংহারক রূপে কল্পনা করিয়াছেন। আজকাল পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও হিন্দুদের এই ত্রিদেব কল্পনা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাঁহারাও বহু চিন্তার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বিশ্বের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় এই তিনটী কার্য্য তিনটী শক্তি হইতেই সম্পন্ন হইতেছে, এই জন্যই হিন্দুরা ব্রহ্মের তিনটীরূপ কল্পনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্রাহ্মণেরা পুরাণে ও উপপুরাণে বহু দেবদেবীর উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের উপাসনা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। যাহাহউক এই সমস্ত দেব দেবীর উপাসনার কথা পর্য্যালোচনা করিয়া এই বুঝিতে পারি যে, কেবল ব্রাহ্মণ জাতির ভরণ পোষণের জন্যই পুরাণে এইরূপ বহুল দেবদেবীর উপাসনা কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে আবার বৈষম্যের ভাব সমস্ত ভারতকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে; ব্রাহ্মণ নিজের আধিপত্য রক্ষার জন্য আবার বৈষম্যরূপ লুতাতন্তু জালে ভারতকে আচ্ছন্ন করিয়াছেন। এই সময় আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণও পাঁচজন কায়স্থ আনয়ন পূর্ব্বক বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করিয়া পুনঃ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাতেই ব্রাহ্মণ যাজকও কায়স্থ যজমান যে জাতি বিদ্যা বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ ও সমাজের আদর্শ, অন্যান্য জাতিরা সেই জাতিরই অনুকরণ করিয়া থাকে। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরাও কায়স্থজাতির অনুকরণে স্ব স্ব জাতির মধ্য হইতে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি করিয়া সমাজ

সৃষ্ট হইয়াছে। এইজন্য যেমন হিন্দু সমাজে কেবল বহুতর জাতি সেইরূপ বহুতর শ্রেণীরও সৃষ্টি হইয়াছে। আবার বৈষম্যের ভাব সমস্ত ভারতকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ব্রাহ্মণ নিজের আধিপত্য রক্ষার জন্য আবার ধর্ম বৈষম্য রূপ দুষ্টতত্ত্ব জালে ভারতকে আচ্ছন্ন করিয়াছেন। কৌলিন্যরূপে উপসর্গ আসিয়া আবার ধর্ম বৈষম্য রূপ রোগের সহিত যোগ দিয়াছে! ব্রাহ্মণেতর ধর্মকে ও জাতিকে জ্ঞান ভাণ্ডারে প্রবেশ করিতে না দেওয়ার ফল হিন্দুধর্মে সাধারণের এই সহানুভূতি বিরহ। বলা বাহুল্য যে হিন্দু ধর্মে ও হিন্দু রাজত্বে সাধারণের এই সহানুভূতি-বিরহই ভারতের জাতীয় পতনের মূল। পাণিপথ সমরক্ষেত্রে যে অগণিত হিন্দু সেনা সমবেত হইয়াছিল, যদি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি ও ব্রাহ্মণ্য রাজত্বের প্রতি তাঁহাদিগের অবিচলিত ভক্তি থাকিত তাহা হইলে সে অজেয় সেনাকে পরাস্ত করিতে কাহার সাধ্য হইত? ভারতের দুর্দশার মূল গৃহ-শত্রু ও আত্মবিচ্ছেদ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রায় সার্দ্ধ তিনসহস্র বৎসর পরে ভারতের স্বাধীনতা নষ্ট হইয়াছে। তখন প্রবল পরাক্রান্ত মুসলমানের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া, আরব, পারস্য, আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান প্রভৃতি স্থানের মুসলমানগণ সমবেত হইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিল, আর হিন্দুরা পরস্পর শত্রুতা করিয়া মুসলমানের সহিত ভিতরে ও বাহিরে যোগ দিয়া, হিন্দুর দেশ মুসলমানের হাতে একে একে তুলিয়া দিতে লাগিল, অবশেষে ভারতের অধিকাংশ স্থানই যবনের পদানত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এই মুসলমান রাজত্ব কালেও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম কিঞ্চিন্মাত্র মলিনতা প্রাপ্ত হয় নাই। বরং পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। যবন সংস্পর্শে জাতি নাযায় এই উদ্দেশ্যে নব্য স্মৃতি শাস্ত্রের উৎপত্তি হইল, সেই স্মৃতির কঠোর বন্ধনে ও বল্লালী কৌলিন্যের কঠিন কষাঘাতে লোক ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিল, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতি যে সমস্ত হিন্দুর জল গ্রহণ করেন না মুসলমানেরা তাহাদিগকে বলিতে লাগিল ভাই সব! তোমরা এত নির্য্যাতিত ও অপদস্থ হইয়া কেন হিন্দু সমাজের অন্তর্ভূক্ত রহিয়াছ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতি তোমাদের অন্নগ্রহণ করা দূরে থাকুক স্পৃশ্য জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না। তোমরা আমাদের ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ কর। আমরা তোমাদিগকে আমাদের সমাজের উচ্চ আসন প্রদান করিব। মুসলমানদের এই মধুর সম্ভাষণে হিন্দু সমাজ দুই সম্প্রদায় হইয়া দাঁড়াইল, এক সম্প্রদায় বলিতে লাগিল, এই ভাল যুক্তি, আমরা ইসলাম ধর্ম্মই গ্রহণ করিব। তাহাহইলেই আর ব্রাহ্মণ কায়স্থ জাতি আমাদিগের আর সেরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখিতে পারিবেনা। এই বলিয়া তাহারা ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। আর অন্য সম্প্রদায় বলিল, না করুক ব্রাহ্মণ কায়স্থ আমাদের জল গ্রহণ আমরা কিছুতেই ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিব না। হিন্দু ধর্ম্মই প্রতিপালন করিব। অন্য সম্প্রদায় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করায়, ও মুসলমানদের মধ্যে বিধবা বিবাহও বহু

বিবাহ প্রচলিত থাকায় বঙ্গদেশে মুসলমানের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে। নতুবা এদেশে মুসলমান ছিলনা। এখন ইংরেজ অধিকৃত দেশে অধীবাসীর তুলনায় ইংরেজের সংখ্যা যেরূপ অল্প, মুসলমান শাসন কালেও সেইরূপ দুই চারিজন রাজপুরুষ মাত্র এদেশে আসিয়াছিলেন। কিন্তু প্রায় সহস্রাধিক বৎসর কাল এদেশ মুসলমান শাসনাধীনে থাকায় উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ব্রাহ্মণ কায়স্থেরাও রাজপুরুষের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকায় ম্লেচ্ছ ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। প্রভুপাদ পরম বৈষ্ণব শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামীই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। দেশের সেই বিষম দুর্দ্দিনে নবদ্বীপে ভক্তাবতার চৈতন্য দেবের আবির্ভাব হয়। তিনি অপূর্ব্ব প্রেম ভক্তির প্রচার করিয়া, ম্লেচ্ছ ভাবাপন্ন হিন্দু-সমাজ, দুর্দ্দমনীয় মুসলমান সমাজ ও নাস্তিক ভাবাপন্ন বৌদ্ধ সমাজকে হরিনামের মোহিণী মন্ত্রে মুগ্ধ করিয়া খোল করতালের উচ্চ ঝঙ্কারে ও মধুর হরিধ্বনিতে ভারতবর্ষ প্লাবিত করিয়াছিলেন। ইহা নিশ্চয়ই ভগবৎশক্তি। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ কেহ তাঁহার নিকট কোনও তর্ক করিবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। সকলেই প্রেমোন্মত্ত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন যদি সেই সময়

চণ্ডালোঽপি মুনি শ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ
বিষ্ণু-ভক্তি বিহীনশ্চ দ্বিজোপি শ্বপচাধমঃ।

এই মহাবাক্য ঘোষিত না হইত, তাহা হইলে নিম্নশ্রেণীর সকল হিন্দুই মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইত।

অষ্টবিধা হ্যেষা ভক্তি যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।
সবিপ্রেন্দ্রোমুনিঃ শ্রীমান্ স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ॥

গরুড় পুরাণের এই শ্লোক ধরিয়া তিনি বৌদ্ধ ও ম্লেচ্ছ দিগকেও

বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া হিন্দুসমাজভুক্ত করিতে লাগিলেন। আর অধিক কি বলিব? বঙ্গদেশ ও হিন্দু সমাজ অতি হতভাগ্য তাই অমন মহাত্মরত্ন অকালে হারাইয়াছে। যদি তাঁহারা ধর্ম্ম প্রচারের সময় পাইতেন, অর্থাৎ অকালে তাঁহাদের পরলোক না হইত, তাহা হইলে দেশের ও সমাজের কত মহোপকার সাধিত হইত তা বলিয়া শেষ করা যায় না। চৈতন্য-পার্ষদগণও সকলেই পরম ভাগবৎ এবং হিন্দুসমাজের একান্ত পূজনীয়। এই সমস্ত মহাত্মা কর্ত্তৃক যেরূপ বৈষ্ণবধর্ম্ম উন্নত হইয়াছিল সেরূপ আর কোনোও কালেই হয় নাই। যে সময়ে তান্ত্রিক উপাসনার সর্ব্বত্র প্রচার হয়, সেই সময় কতিপয় মহানুভব বৈষ্ণবকবি দ্বারা সেই উপাসনার মূলোচ্ছেদ হয়। অর্থাৎ তৎকালে স্ত্রী, মদ ও মাংস লইয়া উপাসনার ছলে মানব সমাজ দানবের তাণ্ডব নর্ত্তনে মত্ত হইয়া পাপের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিল, সেই সময় কতকগুলি বৈষ্ণব কবি জন্মগ্রহণ করিয়া দেশের লোকের রুচি পরিবর্ত্তনের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে নায়ক ও শ্রীরাধিকাকে নায়িকা করিয়া সুমধুর আদি রসাত্মক সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। সাধারণের চিত্ত সেই সঙ্গীতে দ্রবীভূত হওয়ায়, তান্ত্রিক উপাসনার মূলোচ্ছেদ হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও আবার আর এক সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইল। আদর্শপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পারদারিক ও আদ্যাশক্তি শ্রীমতী রাধিকা ব্যাভিচারিনী এই বিশ্বাস অনেকের মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল। অশিক্ষিত নরনারী রাধা-কৃষ্ণের অনুকরণ করিয়া দিন দিন পাপ লীলা খেলার প্রসার বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এবং ঐ সকল সঙ্গীত রচনা হওয়ার পর অনেকগুলি কৃষ্ণলীলার গ্রন্থও রচিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা যে দেশের মহদনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহাকে আর কোনও

সন্দেহ নাই। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমস্ত পুরাণাদি মন্থন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরিত লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, কৃষ্ণ চরিত্রের দোষ ক্ষালন ও হিন্দুর ধর্ম্ম গ্রন্থ গুলির মধ্যে কোনগুলি আদি ও অকৃত্রিম, তাহাই সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করান। সেইজন্য আমি আর সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে চাই না। যাহা হউক ঐ সমস্ত বৈষ্ণব কবি ভারতভূমে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়াই আজও সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম ভারতে আধিপত্য করিতেছে। কিন্তু আজকাল যাহারা বৈষ্ণব বেশধারী তাঁহারা প্রকৃত বৈষ্ণব নহে। ঘোর পাষণ্ড ও ব্যাভিচারের জ্বলন্ত মূর্ত্তি, শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অচলা ভক্তিই মুক্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ইহারাও সেই চৈতন্যের মতাবলম্বী, মুখে এই রূপই বলিয়া থাকে। কিন্তু কার্য্যকালে দেখিতে পাই, রাবণের যোগী বেশ ধারণ যে উদ্দেশে, ইহাদের ভেকধারণও সেই উদ্দেশে। দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত কোনও ব্যক্তিই ইহাদের শাসন সম্বন্ধে কিছু মনোযোগ করেন না বলিয়াই দিন দিন ইহাদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইতেছে। অন্য কোনও শাসনের প্রয়োজন হয়না, কেবল ভিক্ষা দেওয়া বন্ধ করিলেই হয়। কিন্তু এদেশের লোক এমনই নির্ব্বোধ যে, কেহ বা লোকনিন্দার ভয়ে, কেহবা ধর্ম্মের ভয়ে ভিক্ষা দেওয়া বন্ধ করিতে পারে না। তাঁহারা এটী বিবেচনা করিলেন না যে, কুক্রিয়াশক্ত পাষণ্ডদের প্রতিপালন কখন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নয়। যাহারা অন্ধ খঞ্জ বা যে কোনও কারণে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহারাই যথার্থ দয়ার পাত্র কার্য্যক্ষম লোককে ভিক্ষা দিলে ধর্ম্ম সঞ্চয় হয় না, বরং অলসতার পুরস্কার দেওয়ায় অধর্ম্ম সঞ্চয়ই হইয়া থাকে।

হায়! হায়! কি পরিতাপের বিষয় যে পরম পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্ম জগতে অতুলনীয় এবং যাহা হিন্দুর একমাত্র গৌরবের বিষয়, এখন সেই ধর্ম্মযাজকের নাম করিতেই পাপের জলন্ত মূর্ত্তি মনঃক্ষেত্রে প্রতিভাত হয়। আরও এক মহদনিষ্ট সংঘটিত হইতেছে যে, নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে অনেকেই বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী, তাঁহারা অনেকেই ভ্রমান্ধ হইয়া ঐ সমস্ত পাষণ্ডদের নিকট দীক্ষা শিক্ষা গ্রহণ করে ও তাহাদের উপদেশেই ব্যভিচারক হয়, এই জন্ত আরও হিন্দু-সমাজ দিন দিন ছারেখারে যাইতেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মুসলমান রাজত্বে হিন্দুধর্ম্ম যেরূপে রক্ষা পাইয়াছিল, তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে, এখন ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে আবার অন্ত মূর্ত্তি ধারণ করিল। তৎকালে খৃষ্টীয় মিসনরিগণ অবাধে হিন্দুধর্ম্মের দোষোদঘাটন করিয়া বেড়াইতেন। তরল-মতি হিন্দু যুবকগণ সেই কুহকে পড়িয়া দলে দলে খৃষ্টান হইতে লাগিল। সেই স্বধর্ম্মভ্রষ্ট যুবকদলের জননীর ক্রন্দনে ও আত্মীয় আর্ত্তনাদে কিছুকাল ভারত-গগন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এই সময় মহাত্মা রামমোহন রায় প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, বাহ্যপূজামূলক সাকার হিন্দুধর্ম্ম দ্বারা খৃষ্টীয় ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন অসম্ভব। এইজন্ত তিনি হিন্দু ধর্ম্মের নিরাকারবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্মে একটী অবতার হিন্দুধর্ম্মে তেত্রিশকোটী অবতার; সুতরাং খৃষ্টীয়

মিসনরিগণ খৃষ্টান ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইজন্যই অনেক যুবক খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় নিরাকার একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া এই স্রোত রোধ করিলেন, 'ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই অদ্বৈতবাদের নূতন ব্যাখ্যা করিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে খৃষ্টান্ ইউনিটেরিয়ান ধর্ম্মের সমান করিলেন। একমেবাদ্বিতীয়ম্—ইহার অদ্বৈতবাদী অর্থ এই যে, এই জগতে একমাত্র সত্তা আছে—সেই সত্তা ঈশ্বর; কিন্তু রামমোহন রায় ব্যাখ্যা করিলেন যে, ঈশ্বর এক বই দ্বিতীয় নাই। রামমোহন রায়ের এই ব্যাখ্যায় মোহিত হইয়া হিন্দুযুবকগণ দলেদলে ব্রাহ্ম হইতে লাগিলেন। তৎকালে ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বিবেচিত হইত না। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে সকলেই হিন্দুধর্ম্মের সারসংগ্রহ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ব্রাহ্মরাও তৎকালে আমরা হিন্দু নহি, এই জয় পতাকা মাথায় বাঁধে নাই। সুতরাং প্রবীণ হিন্দুরাও ব্রাহ্মসমাজে গিয়া ব্রহ্মোপাসনায় যোগ দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-সমাজ এখন আদি ব্রাহ্মসমাজ নামে খ্যাত। এই আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত হিন্দুসমাজের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; কারণ আদি ব্রাহ্মসমাজ বেদাদি হিন্দুধর্ম্ম-গ্রন্থকে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করায়, হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন না। প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন রায় হিন্দু অদ্বৈতবাদের নূতন ব্যাখ্যা করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে নূতন আকার দিলেন বটে, কিন্তু উভয় সমাজকে স্নেহ সূত্রে আবদ্ধ রাখিলেন। দিন দিন ব্রাহ্মসমাজের সহিত হিন্দুসমাজের ঘনিষ্ঠ হইতে ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ স্থাপিত হইতেছিল, এমন সময় সেই মহাপুরুষের অকালে মৃত্যু হইল। ভারত-গগনে সহসা

যেন অকাল মেঘ উদিত হইল। কিছুদিন সকলে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। এমন সময় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। হিন্দুসমাজকে তুলিব, হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রের নব নব ব্যাখ্যা করিয়া ইহাকে সময়োপযোগী বেশভূষায় বিভূষিত করিব, কেশববাবুর মনে তখন, ইচ্ছা হইল না। তিনি সমস্ত ভারতবর্ষকে এবং শেষে সমস্ত পৃথিবীকে, এক ধর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ করিবেন সঙ্কল্প করিলেন। তিনি সংস্কৃত তত জানিতেন না বলিয়া সংস্কৃত শাস্ত্রের মূল্য বুঝিতেন না; সুতরাং আর্য্যধর্ম্ম-শাস্ত্র অপেক্ষা বাইবেল তখন তাঁহার অধিকতর চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টানধর্ম্মকে কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত করিয়া ভারতে চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। খৃষ্টীয় আচার-ব্যবহার এবং উপাসনা-পদ্ধতি পর্য্যন্ত তিনি ব্রাহ্মসমাজে চালাইবার চেষ্টা করিলেন, এবং তদ্বিষয়ে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন, এইরূপে ব্রাহ্মসমাজ ক্রমে ক্রমে অতর্কিতভাবে হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল।

কেশববাবু সমস্ত ভারতবর্ষকে এক ধর্ম্ম-সূত্রে আবদ্ধ করিতে গিয়া হিন্দুসমাজ হইতে মৌলিক সম্প্রদায়কে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে ব্রাহ্মসমাজ ও হিন্দুসমাজ উভয়েরই সমূহ ক্ষতি হইল। স্থিতিশীল জনবহুল হিন্দুসমাজকে যাঁহারা সর্ব্বদা সংস্কারের জন্য উত্তেজিত করিতেন, তাঁহারা বাহিরে গিয়া পড়ায়, হিন্দুসমাজ আবার নিমীলিত-নেত্র হইল। যেকিছু আবশ্যক সংস্কার তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের স্কন্ধে চাপাইয়া নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। অলসের যে সান্ত্বনা, তাহাদিগেরও সেই সান্ত্বনা। অলসেরা যেমন পাছে নড়িতে হয় বলিয়া যে অবস্থায় থাকে, সেই অবস্থাতেই

সন্তুষ্ট হয়, সেইরূপ স্থিতিশীল হিন্দুসমাজ কাজ করিবার ভয়ে যাহা আছে, তাহাই ভাল বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। এদিকে ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অনিয়মিত গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যাহা পরিত্যাগ করা যায়, তাহার সৌন্দর্য্য দেখাইবার মানুষের আর প্রবৃত্তি হয় না। ভাল জিনিষ ছাড়িয়া আসিয়াছি ভাবিতেও মনে কষ্ট হয় বলিয়া লোকে অবশেষে পরিত্যক্ত দ্রব্যের কেবল দোষাংশ ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিতে আরম্ভ করে। ব্রাহ্মসমাজও তাহাই করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিত্যক্ত হিন্দুসমাজের ও হিন্দুধর্ম্মের কেবল দোষাংশ দেখাই তাঁহাদিগের প্রধান কর্ম্ম হইয়া উঠিল। যে সকল সমাজ-সংস্কার তাঁহাদিগের হৃদয়ের অতি পবিত্র বস্তু, হিন্দুমতে সে সকল সংস্কার-কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে, তাঁহারা যোগ দিতে অসম্মত হইতে লাগিলেন। আমার একটী প্রিয় ব্রাহ্মবন্ধু, যেমতে হউক বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য এক সময় প্রাণোৎসর্গ করিয়াছিলেন; কিন্তু হিন্দু-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর, তাঁহার আর সে মতি-গতি রহিল না। একবার হিন্দুমতে একটী আনুষ্ঠানিক বিধবা বিবাহে-আহুত হইয়া তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে, বিবাহস্থলে শালগ্রাম উপস্থিত থাকিলে, তিনি তথায় যাইতে পারিবেন না। হিন্দুধর্ম্মে ও হিন্দুসমাজে আর তাঁহারা কিছুই ভাল দেখিতে পাইলেন না। হিন্দুনাম তাঁহাদিগের নিকট অপবিত্র বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। তাঁহারা সেইজন্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজকে খৃষ্টীয়-সমাজ ও খৃষ্টীয়ধর্ম্মের আদর্শে গঠিত করিয়া লইলেন। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুসমাজ ও হিন্দু-

ধর্ম্ম হইতে ক্রমশঃ অধিকতর দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িল। ইহা উভয় সমাজের পক্ষেই একটী শোচনীয় রাজনৈতিক দুর্ঘটনা। কোথায় শতধা বিচ্ছিন্ন-হিন্দুসমাজ ক্রমশঃ আভ্যন্তরীণ বিদ্বেষভাব ভুলিয়া পরস্পরের সহিত অধিকতর ঘনীভূত হইবে, না ক্রমশঃ আরও বিচ্ছিন্ন হইতে চলিল। কেশব বাবু শেষকালে এই ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সংশোধন আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ কালবশে অকালে প্রাণ হারাইলেন; সুতরাং তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি হইল না। উন্নতিশীল ব্রাহ্মসমাজ, স্থিতিশীল হিন্দুসমাজের ভিতর থাকিলে পরস্পার সংঘর্ষে পরস্পরই উপকৃত ও উন্নীত হইতে পারিতেন, কিন্তু এক্ষণে তাহার বিপরীত হইতে চলিল। উভয় সমাজের ভিতর অতর্কিতভাবে কি যেন এক শত্রুতা ভাব দাঁড়াইয়া উঠিতেছে। পরস্পার পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ বিশিষ্ট, পরস্পার পরস্পরের প্রতি মমতাশূন্য। যাহা কিছু হিন্দুত্ব, ব্রাহ্মের চক্ষে তাহাই যেন অপবিত্র বলিয়া প্রতীত হয়। আজকাল দেখিতেছি, হিন্দু সমাজের ভিতরও ব্রাহ্মগণের বিরুদ্ধে সেইরূপ কি যেন এক ভাব উঠিতেছে। এই ভাব-তরঙ্গ যে শুদ্ধ প্রাচীন সম্প্রদায়ে আবদ্ধ তাহা নহে। নব্য সম্প্রদায়ের ভিতরও ইহার প্রবল উচ্ছ্বাস দেখা যাইতেছে। এইভাব বহুদিন ধরিয়া প্রধূমিত হইতেছিল, এক্ষণে তাহার স্ফুলিঙ্গ আবির্ভূত হইয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বর্ত্তমান যুগে সদাশয় গভর্ণমেণ্টের অনুকম্পায় ভারতীয় সকল জাতিই বিদ্যার বিমল জ্যোতির মুখ দেখিতে পাইয়াছে এবং ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকল জাতিই জাতীয় উন্নতি-কল্পে সভা-সমিতি গঠন করিতেছে। যাহারা অনাচরণীয় জাতি, তাহারা এইরূপ নির্যাতিত ও অপদস্থ হইয়া আর হিন্দু-সমাজে থাকা শ্রেয়স্কর বোধ করিতেছে না। বরিশালের নমঃশূদ্রেরা হিন্দুসমাজে অনাচরণীয় থাকা কষ্টকর মনে করিয়া খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে। যে সমস্ত জাতি জল চল চাহিতেছে, তাহাদের এই প্রার্থনা যদি ব্রাহ্মণ ও কায়স্থসমাজ পূর্ণ না করেন, তাহা হইলে যে তাহারা অন্য ধর্ম্মাবলম্বী হইবে তাহা আর বিচিত্র কি? যাহা হউক সমাজের এই বিষম দুর্দ্দিনে আমাদের সকলেরই সাম্য-মৈত্রী ভাব অবলম্বন করা উচিত। হিন্দুসমাজ যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিতে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে, এক্ষণে কিরূপে সেইগুলির ক্রমিক সমন্বয় হইতে পারে, আমাদিগকে তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। ইহা অতি কঠোর সাধনা। ইহার উপর যদি আমরা হিন্দুসমাজকে আরও অবান্তর ভাগে বিভক্ত করিতে থাকি, তাহা হইলে হিন্দুসমাজের আভ্যন্তরীণ ক্ষত আর কখনও শুকাইবে না। সামাজিক একতার সহিত রাজনৈতিক একতার এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, একের অভাবে আর একটী কখন পরিপুষ্ট হইতে পারে না। যদি তোমার সহিত আমার সামাজিক সহানুভূতি না রহিল, তবে তোমার রাজনৈতিক

উন্নতিতে আমার পূর্ণমাত্রায় আনন্দ হইবে কেন? যদি নিম্নজাতি-সাধারণ উচ্চজাতির সহিত সহানুভূতি করিত, তাহা হইলে যবনেরা কখন ভারতে লব্ধ-প্রবেশ হইতে পারিত না। উচ্চ জাতি নিম্নজাতির প্রতি যেরূপ ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাতে উচ্চজাতির প্রতি নিম্নজাতির মমতা থাকিতে পারে না। এই জন্য, তাহারা কোন প্রকার রাজনৈতিক আবর্ত্তনে কোনও ইচ্ছা প্রকাশ করে না। তাহারা জানে, রাজা যিনিই হউন না কেন, তাহাদিগের অবস্থা পরিবর্ত্তনের কোন আশা নাই। সুতরাং রাজ-পরিবর্ত্তনে তাহাদিগের কোনও স্বার্থ নাই। এদিকে উচ্চজাতি সংখ্যায় অতি হীনবল। নিম্নজাতি নিরপেক্ষ হইয়া তাহারা বহিশ্চর অন্তশ্চর শত্রু নিবারণে অসমর্থ হইয়া পড়ে। হিন্দুর উন্নতির প্রধান অন্তরায় জাতি-বৈষম্য যাহাতে আর বর্দ্ধিত না হয়, বরং ক্রমে ক্রমে কমিতে থাকে, আমাদিগকে প্রাণপণে তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। সামান্য সামান্য কারণে ব্যক্তিপুঞ্জকে সমাজচ্যুত করিয়া খণ্ডশঃ বিভক্ত হিন্দু-সমাজকে আরও বিভক্ত করা আত্মঘাত ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব আমরা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই অনুরোধ করি, তাঁহারা আর সামান্য সামান্য কারণে লোককে জাতিচ্যুত করিয়া হিন্দু-সমাজকে আরও হীনবল না করেন। যখন দেখিতেছি, ইউ-রোপ ও আমেরিকা পার্থিব সভ্যতাবিষয়ে আমাদিগের অপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে, তখন স্বদেশের উন্নতি-সাধন করে, ইউরোপ ও আমেরিকায় যাত্রা করা একান্ত আবশ্যক; কারণ তুলনায় সমালোচনা দ্বারা আত্মদোষ পরিবর্জ্জন ও পরোৎ-কর্ষের অনুকরণ ব্যতীত কখন দ্রুত উন্নতি সাধন হয় না। যদি

কোন দেশ জাতীয় কুসংস্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক জগতের উৎ রাশির অনুকরণে জাতীয় উৎকর্ষ বিধান করিতে পারে, তাহা হইলে সেদেশ অচিরে স্বর্গ রাজ্যে পরিণত হইতে পারে। মনুষ্য-জাতি আজ পর্য্যন্ত যত কিছু উন্নতি সাধন করিয়াছে, আমরা বিনা পরিশ্রমে বা অল্প পরিশ্রমে স্বদেশে আনয়ন করিতে পারি। মধুকর যেমন নানা পুষ্প হইতে মধু আহরণ করিয়া মধুচক্র প্রস্তুত করে, আমরাও ইচ্ছা করিলে নানা দেশের রত্নরাজি আহরণ করিয়া স্বদেশের মুখ উজ্জল করিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে ভার-তের জ্ঞানার্জ্জনী বিদ্যা ও নিষ্কামধর্ম্ম এবং ইউরোপের শিল্প ও বিজ্ঞান যদি এক সময়ে একদেশেই স্থান পায়, তাহা হইলে সেই দেশ কবিকল্পিত নন্দনকাননে পরিণত হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ কি? জাপানের দ্রুত উন্নতির মূল, এই পরোৎকর্ষের অনু করণ। উন্নতিশীল জাপান দেখিতে দেখিতে ব্রিটনের সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইল। এদিকে প্রাচীন ভারত প্রাচীন চীন স্থিতিশীলতা দোষে প্রায় পূর্ব্বাবস্থায় রহিয়া গেল। এখনও সময় আছে; এখনও আমরা স্থিতিশীলতা দোষ পরিহার করিলে দেশের অনেক মঙ্গল সাধন করিতে পারি।

জাপান যেমন প্রতিবৎসর দলে দলে যুবকবৃন্দকে ইউরোপ ও আমেরিকায় পাঠাইতেছে, আমরাও যদি প্রতিবৎসর সেইরূপ শিল্প, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান শিখিবার জন্য দলে দলে ভারতীয় যুবক-মণ্ডলীকে ইউরোপ ও আমেরিকায় পাঠাইতে পারি, তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যে ভারতের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে। যে যে গুণে ইউরোপ ও আমেরিকা জগৎকে পরাজিত করিয়াছে, উক্ত যুবকমণ্ডলীর দ্বারা আমাদিগের দেশে সেই সকল গুণরাশি

আনিতে হইবে। উভয় দেশের উৎকর্ষ তারতম্য এইরূপে ক্রমেই কমিতে থাকিবে। যখন এই জাতীয়-সংমিশ্রণে এত মঙ্গল সাধিত হইবার সম্ভাবনা, তখন ইহার পথে কণ্টক রোপণ করা স্বদেশানুরাগী ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। ইউরোপ-প্রত্যাগত যুবকমণ্ডলীকে সমাজচ্যুত করিয়া ভবিষ্য বিলাত গমনের পথে বাধা দেওয়া উচিত নহে। যে কার্য্য ভাল বলিয়া জানি, যে তাহা করিবে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে পুনঃপ্রবেশ করিতে বলা উচিত নহে। মূর্খ লোকের ভয়ে যুক্তি ও শাস্ত্রের মস্তকে পদাঘাত করা উচিত নহে। শাস্ত্রে জ্ঞানশিক্ষার জন্য বিদেশে গমন করা নিষিদ্ধ হয় নাই।

বাণিজ্যব্যপদেশে অর্ণবযানে দেশ-দেশান্তরে গমনের প্রথা পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল। তবে কেন আমরা স্থিতিশীলতার দাস হইয়া সমাজের শীর্ষভূত যুবকমণ্ডলীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া সমাজকে হীনবল করি? আধিপত্য ধনসম্পত্তিতে তাঁহারা স্থিতিশীল হিন্দুসমাজ অপেক্ষা ন্যূন নহেন। তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইলে স্থিতিশীল হিন্দুসমাজ অধিকদিন তাঁহাদিগকে চাপিয়া রাখিতে পারিবেন না। যে সকল শীর্ষভুক্ত নব্য সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যাত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া উন্নতিশীল দলকে হীনবল করিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আবার সমাজভুক্ত করিয়া হিন্দুসমাজ নিজবল বৃদ্ধি ও ভারতের ভবিষ্য একতার সূত্রপাত করিতে পারেন। হিন্দুসমাজ যখন তেজস্বী ছিলেন, যখন সত্যকে দেবতা ভাবে পূজা করিতেন, যখন সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতেন, তখন ইহার ঔজ্জ্বল্যে জগৎ ঝলসিত হইয়াছিল; কিন্তু আজ হিন্দুসমাজ পতিত, আজ হিন্দুসমাজে সে সত্য-

প্রিয়তা নাই, সত্যের জন্য সে আত্মোৎসর্গ নাই, তাই হিন্দুসমাজে এত কপটাচার প্রবেশ করিয়াছে। সত্য গিয়াছে, সত্যের আবরণ পড়িয়া আছে মাত্র, আত্মা গিয়াছে দেহ পড়িয়া আছে মাত্র। হিন্দুসমাজ এখন স্পষ্ট বলিয়া দেয় যে, তুমি যাহা কর না কেন, গোপনে করিও। তাহা হইলে আর তোমার কোন ভয় নাই। যদি তুমি সত্য বল, তোমায় জাতিচ্যুত করিব। আজ বিলাতফেরতগণ এই জন্যই হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন। বিলাতযাত্রিগণ যে অপরাধে অপরাধী, আজকাল সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশই প্রায় সেই অপরাধে অপরাধী। তবে একদলকে রাখিয়া আর একদলকে কেন পরিত্যাগ করা হয়? সত্যের এই অনাদর কেন? উইলসনের হোটেলে খাইলে যদি সমাজচ্যুত না কর, তবে বিলাতের হোটেলে খাইলে জাতিচ্যুত কর কেন? একজন গোপনে করে আর একজন গোপনে করিতে পারে না বলিয়া? একজনের অপরাধ যে সে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য বিদেশে গিয়া গত্যন্তর নাই বলিয়া বৈদেশিকের অন্নগ্রহণ করে, আর একজন গৃহের অন্ন থাকিতেও শুদ্ধ রুচি-পরিবর্দ্ধনের জন্য যবনান্ন গ্রহণ করে।

যদি যবনান্ন গ্রহণ করা বাস্তবিকই দোষ হয়, তাহা হইলে কাহার দোষ গুরুতর? একজনের লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইল, আর এক জনের গুরুপাপে লঘুদণ্ড, এই দণ্ডের তারতম্য কেন? একজনের অপরাধ ইচ্ছাকৃত, অপরের অপরাধ কার্য্যবশতঃ। তবে লঘুপাপীর উপর অধিকতর নির্যাতন কেন? পূর্ব্বোল্লিখিত হিন্দুসমাজ বলেন যে, বিলাতফেরতের সংখ্যা অতি অল্প; সুতরাং হিন্দুসমাজ তাঁহাদিগকে অনায়াসেই পরিত্যাগ করিতে

পারেন, কিন্তু ইহা যুক্তিযুক্ত কথা নহে। সমাজদ্রোহী ভিন্ন এরূপ কথা কেহ বলিবেন না। মহাজন বলিয়া গিয়াছেন, একতাই প্রকৃত সামাজিক শক্তি। হিন্দুসমাজে একতা নাই বলিয়া ইহা সামাজিক শক্তিশূন্য। হিন্দুসমাজ বলিলে ইহাতে ঘনীভূত একপক্ষ সঞ্চালিত কোন শক্তি কেন্দ্র বুঝায় না। ইহা দ্বারা পরস্পর মমতাশূন্য, দূর-বিক্ষিপ্ত, নির্লক্ষ্য বা বিভিন্ন লক্ষ অসংখ্য সম্প্রদায়ের সমষ্টিমাত্র বুঝায়। যতদিন না আমরা হিন্দু-সমাজকে একটী ঘনীভূত, একলক্ষ্য শক্তিকেন্দ্র করিয়া তুলিতে পারিতেছি, ততদিন আমাদিগের একটী উন্নত জাতিরূপে পরিণত হইবার সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক পণ্ডিতমণ্ডলীকে আর সমাজের হর্ত্তাকর্ত্তা রাখা কর্ত্তব্য নহে। যাঁহারা প্রকৃত শিক্ষিত ও দেশের ও সমাজের হিতকাঙ্ক্ষী, তাঁহাদিগের হস্তেই সমাজের শাসন-দণ্ড রাখা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বাপরই হিন্দুসমাজের শাসন দণ্ড ব্রাহ্মণ কায়স্থের হস্তগত এবং ভবিষ্যতেও তাহাদিগের হস্তেই থাকিবে, তাহাতে কাহারও কোন আপত্তির কারণ নাই; তবে কথা এই যে স্বর্গীয় বিদ্যা-সাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র এ সমাজের উচ্চআসন পাইলেন না, সেই আসনে কতকগুলি স্মৃতির পণ্ডিত উপবেশন করিল, ইহাই আমার দুঃখ। যাঁহারা স্মৃতিভিন্ন অন্যশাস্ত্র জানে না এমন কি পৃথিবী কত বড়, ইহাতে কতলোকের বসতি ইহাও যিনি অবগত নহেন, তিনিই হিন্দুসমাজের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। যতদিন এই স্মৃতিশাস্ত্র ভস্মীভূত না হইবে, ততদিন আর দেশের মঙ্গল নাই। কেন না এই স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারেই হিন্দুসমাজ বিদেশ প্রত্যাগত শিক্ষিত যুবকমণ্ডলীকে হিন্দুসমাজে স্থান দিতে পারিতেছেন না।

স্মৃতির ব্যবস্থানুসারেই যাঁহারা দেশের গণ্যমান্য, বিদ্যাবুদ্ধিতে বিভূষিত, সমস্ত সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত, সেই সমস্ত মহাপুরুষদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিত্যাগ করা হইয়াছে। হিন্দুসমাজ যাঁহাকে জাতিভ্রষ্ট বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছেন, অন্য সমাজ তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন। এইরূপে হিন্দুসমাজ দিন দিন ধ্বংসপুরে যাইতেছেন। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতি যে সমস্ত হিন্দুর জলগ্রহণ করেন না, সেই সমস্ত জাতি উক্ত জাতিদ্বয়ের প্রতি বিশেষ অসন্তুষ্ট, কিন্তু তাঁহাদের আচার রীতিনীতি গ্রহণে সকলেই শ্রদ্ধাবান। ইহা অতীব সুখের বিষয়, কিন্তু এই দুই জাতির ভিতরেও যে সকল মহৎদোষ অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া সমাজের বিশেষ অনিষ্ট করিতেছে, এক্ষণে তাহারই অলোচনা করা যাউক। এই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির মধ্যেই বল্লাল-প্রদত্ত কৌলিন্যপ্রথা বর্ত্তমান এবং কুলীনেরাই সমাজে বরণীয়, সামাজিক উন্নতিকল্পে, ব্যক্তিগত ভাবে বল্লাল সেন—

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্
নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং নবধাকুললক্ষণম্ ॥

এই নবগুণ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক স্বরূপ কুলীন আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন এবং বিবাহবন্ধনেও মেল বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় ভিন্ন কায়স্থের কুল কন্যাগত। অর্থাৎ কুলীন ব্রাহ্মণ কায়স্থদিগকে সম-পর্য্যায়ে কুলীনের ছেলের সহিত মেয়ের বিবাহ দিতে হইবে নাদিলে কুলভঙ্গ হইয়া বংশজ হইতে হইবে। এই মেলবন্ধ করায় দেশের সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে। কুলীন ব্রাহ্মণেরা পর্য্যায়মত মেয়ের বিবাহ দিতে না পারিলে, কুলভঙ্গের ভয়ে

কন্যাকে চিরকুমারী করিয়া রাখেন, অথবা জরাভারগ্রস্ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন একটা অপদার্থকে আনিয়া যুবতী কন্যাকে তাহার করে অর্পণ করিয়া, পিতার কর্ত্তব্য শেষ করেন। কন্যা মুর্খের হাতে পড়িয়া সেই মনের দুঃখেই হউক, অথবা অকালে বৈধব্য দশায় পতিত হইয়াই হউক, নিজের কর্ত্তব্য নিজেই স্থির করেন। অর্থাৎ উদ্বন্ধনে, কি বিষপানে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। আর না হয়, পাপের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া পিতৃ পিতামহের মুখোজ্জ্বল করেন। আবার দেখিতে পাই কোনও কোনও কুলপাংশুল, কুলনাশের আশঙ্কায় মেয়ের বিবাহই দেন না, অথবা একটী বরের সঙ্গে পাঁচটী কন্যার বিবাহ দিয়া কন্যাদায় হইতে মুক্ত হন। যে ব্রাহ্মণজাতি বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতিতে সকল জাতির শ্রেষ্ঠ, যাঁহারা সমগ্র হিন্দু সমাজের নেতা ও ধর্ম্ম কর্ম্মের উপদেষ্টা, তাঁহাদেরই মধ্যে এই সমস্ত মহৎ দোষ মজ্জায় মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। কুলীনেরা কুলভঙ্গ করিয়া বংশজ কি শ্রোত্রীয়ের ছেলের সহিত মেয়ের বিবাহ দেন না। আবার শ্রোত্রীয়ব্রাহ্মণের ছেলেরাও অর্থাভাবে বিবাহ করিতে পারেন না। শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণের বংশ ক্রমশঃ এইরূপ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। কেবল সমাজের দুর্নীতি বশতঃ একই জাতীয় লোকের ভিতরেই কতকগুলি ছেলে ও কতকগুলি মেয়ের বিবাহ না হইয়া সমাজ দিন দিন ছারেখারে যাইতেছে। ব্রাহ্মণসমাজ শিক্ষিত বলিয়া যে অভিমান করেন, সে বৃথা। কেন না তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষিত হইলে কি আর দেশের এই সমাজের দুর্দশা হইতে পারে ?

ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের কৌলিন্যপ্রথা একরূপ হইলেও কায়স্থ

সমাজ কন্যাকে চিরকুমারী করিয়া রাখিবার কি একবরের সঙ্গে একাধিক কন্যার বিবাহ দিবার প্রথা কোনও কালেই নাই। যদি পুত্র কন্যার মনমত বিবাহ দিতে না পারেন, তবে উপযুক্ত সময় পুত্র কন্যার বিবাহ কুল ভঙ্গ করিয়াই দিয়া থাকেন। আর এই কায়স্থ সমাজে কৌলিন্য প্রথা থাকিলেও সম্প্রতি কৌলিন্যমর্য্যাদার চেয়ে শিক্ষার আদরই বেশী বাড়িয়াছে। ইহা প্রকৃত প্রস্তাবেই সুখের বিষয় ও সমাজের উন্নতিজনক। আবার শুনিতেছি, চারি শ্রেণীর কায়স্থই এক সমাজভুক্ত হইবে। যদি তাই হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ সমাজ হইতেও যে কায়স্থ সমাজ উন্নত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা মুখে যেরূপ বক্তৃতা দিয়া থাকেন, কার্য্যকালে তাহার কিছুই করেন না। মুখে বলিয়া থাকেন, কৌলিন্য প্রথা কিছু নয়, কন্যার পিতার নিকট কায়দা করিয়া টাকা লইবেনা, কিন্তু কার্য্যকালে দেখিতে পাই, ছেলেরঅন্নপ্রাশন হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত, যে ব্যয় হইয়াছে, তাহা সুদে আসলে একুন করিয়া মেয়ের বাপের নিকট আদায় করা হয়। যতদিন এ অত্যাচার সমাজ হইতে দূর না হইতেছে ততদিন কায়স্থ সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কখনই সম্ভবপর নহে।

পুরুষ প্রকৃতি উভয়ই বিধাতার সৃষ্টি; এবং সমস্ত বিষয়েই উভয়ের তুল্য অধিকার। কিন্তু ভারতের হিন্দু মহিলার সম্বন্ধে অগ্রে যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে, স্ত্রীজাতি বিধাতার সৃষ্টির বাহিরে, এবং নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ ভোগের জন্যই ইহাদের জন্ম হইয়াছে। পুরুষ সহস্র দোষে দোষী হইলেও

স্ত্রী তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না, কিন্তু স্ত্রী যদি স্বামীর একটী কথার অবাধ্য হয়, তাহা হইলে স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। এমন কি স্ত্রীজাতিকে হিন্দুজাতি খাদ্য সামগ্রীর ন্যায় মনে করেন। মদিরা পানোন্মত্ত বেশ্যাসক্ত মূর্খপুত্র পিতার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবে, কিন্তু সর্ব্ব গুণান্বিতা বিদুষী ধর্ম্মশীলা কন্যা পিতার কপর্দ্দকও পাইবে না। জীবনের উপাস্য দেবতা, সুখ দুঃখের কর্ত্তা স্বামী তাহাও পিতা বা অন্য কোনও অভিভাবক কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবে। কিন্তু প্রাচীন ভারতে এরূপ নিয়ম ছিলনা। মনুষ্যের যত প্রকার বিবাহ ঘটিতে পারিত, মনু তৎসমুদয়কে আট ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব এবং পৈশাচ।*

১। বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা কন্যাবরের আচ্ছাদন ও পূজন পুরঃসর বিদ্যা সদাচার সম্পন্ন অপ্রার্থক বরকে কন্যাদান করার নাম "ব্রাহ্ম-বিবাহ"। এই বিবাহ হিন্দুদিগের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচলিত। অতি বিস্তৃত জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে কর্ম্মকর্ত্তা ঋত্বিককে সালঙ্কৃতা কন্যাদান করাকে দৈব বিবাহ বলাযায়। এই প্রকার বিবাহ এক্ষণে সম্পূর্ণ অপ্রচলিত এবং ইহার পুনঃ প্রবর্ত্তনারও কোন আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না। ২। বরের নিকট হইতে এক বা দুই গো মিথুন গ্রহণ পূর্ব্বক যে কন্যাদান তাহার নাম আর্ষ-বিবাহ। ৩। এই বিবাহও এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে অপ্রচলিত রহিয়াছে, ইহারও

* ব্রাহ্মো দৈব স্তথা বার্ষ প্রাজাপত্য স্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষস শ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্ট মোহধমঃ।

পুনঃ প্রবর্ত্তনা অনাবশ্যক। ৪। তোমরা উভয়ে ধর্ম্মের আচরণ কর, বর ও কন্যাকে এই কথা বলিয়া অর্চ্চনা পূর্ব্বক কন্যাদানের নাম প্রাজাপত্য বিবাহ। ৫। কন্যার পিত্রাদিকে এবং কন্যাকে শক্ত্যানুসারে শুল্ক দিয়া বরের স্বেচ্ছানুসারে যে কন্যা গ্রহণ তাদৃশ বিবাহকে আসুর বিবাহ বলা যায়। ৬। কন্যা উভয়ের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ সহকারে যে বিবাহ হয়, তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলাযায়। ৭। এই গান্ধর্ব্ব বিবাহ এক্ষণে প্রচলিত নাই। এই বিবাহের পুনঃ প্রচলন আরম্ভ হইলে, কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রূণহত্যার ভীষণ পাতকে আর দূষিত ও কলঙ্কিত হইবেনা। তাহাহইলে প্রণয়ীও প্রণয়িনীর পবিত্র সম্মিলন আর ব্যাভিচার নামে আখ্যাত হইবে না। তাহা হইলে কত দুষ্মন্ত ও কত শকুন্তলা আমাদের নয়ন সমক্ষে রমণীয় আকার ধারণ করিবে এবং কত ভরত, আলেকজাণ্ডার ও কত যীসস্ মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া জগতের সিংহাসন অধিকার করিবেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আসুর বিবাহ এখনও অনেক স্থানে প্রচলিত রহিয়াছে। বংশজ ও শ্রোত্রীয় বরের বিবাহে এইরূপ শুল্ক দেওয়ার প্রথা অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। বিপক্ষ কন্যাপক্ষীয়দিগকে হত ও আহত করিয়া প্রাচীরাদি ভেদ পূর্ব্বক রোরুদ্যমানা ক্রোধান্বিতা কন্যা-হরণের নাম রাক্ষস-বিবাহ। নিদ্রাভিভূতা বা মদ্যপানে বিহ্বলা অথবা অনবধানযুক্তা স্ত্রীতে নির্জ্জন প্রদেশে গমন করার নাম পৈশাচ বিবাহ। আট প্রকার বিবাহের মধ্যে ইহা পাপজনক ও অতি অধম। বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে পৃথিবীতে বহু প্রকার মত প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে মনু ও মহর্ষিদের মত সর্ব্বোৎকৃষ্ট,

এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইলেও দোষশূন্য নহে। তন্মধ্যে কেবল মনুর মতের দোষগুণ বিচার করাই আমার উদ্দেশ্য। বিবাহ কাহাকে বলে' এবং ইহার উদ্দেশ্যই বা কি এই গুরুতর প্রশ্নের কে উত্তর দিবে? সাধারণ লোকে ইহার মূল অনুসন্ধান করিবে না। তাহারা বলিবে, শুভদিনে শুভলগ্নে বর ও কন্যা পক্ষীয়দিগের সম্মুখে অগ্নি সাক্ষী করিয়া কন্যা বরের যে পরস্পরের পাণিগ্রহণ তাহাই বিবাহ, আর পুত্র উৎপাদন করাই ইহার উদ্দেশ্য। কিন্তু চিন্তাশীল সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত বিবাহের এই লক্ষণে শুদ্ধ এই উদ্দেশ্য নির্ব্বাচনে পরিতৃপ্ত হইবেন না। দেখা যাউক আমরা এই চিন্তাশীল সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি কি না? মনুবলেন, "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" পুত্র উৎপাদন করিবার নিমিত্ত স্ত্রী ও পুরুষের যে পরস্পর মিলন, তাহাকে বিবাহ বলাযায়। কেহ বলেন, প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর সংসর্গ সাপেক্ষ হৃদয় ও মনের যে মিলন তাহাই বিবাহ। আমরা এই দুই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তয়িতার মতদ্বয়ের সামঞ্জস্য বিধান পূর্ব্বক বিবাহের লক্ষণ নির্দ্দেশ করি। প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর সংসর্গ সাপেক্ষ হৃদয় ও মনের যে মিলন তাহাই বিবাহ। শেষোক্ত ব্যক্তিরা যে বিবাহের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা প্রণয়ের লক্ষণ, বিবাহের লক্ষণ নহে। প্রণয় ও বন্ধুত্ব একই; তবে কেবল এই মাত্র প্রভেদ যে, স্ত্রী ও পুরুষের, হৃদয় ও মনের মিলন হইলে তাহাকে আমরা প্রণয় বলি, এবং স্ত্রী ও স্ত্রীর বা পুরুষ ও পুরুষের হৃদয় ও মনের মিলন হইলে তাহাকে আমরা বন্ধুত্ব বলি। সুতরাং বন্ধুত্বকে যেমন আমরা বিবাহ বলি না, সেইরূপ শুদ্ধ প্রণয়কেও, আমরা বিবাহ

বলি না। আমাদিগের মতে, হৃদয় মন ও শরীর এ তিনেরই মিলন না হইলে বিবাহ সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু এই দুঃখময় জগতে আমরা বিবাহের এ পবিত্র ও পূর্ণ ভাবের কত সহস্র ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। পৃথিবীর বিশেষতঃ হতভাগ্য ভারত-ভূমির প্রতিগৃহই এই ব্যতিক্রমের বিষময় ফলভোগ করিতেছে। প্রতি সুশিক্ষিত ব্যক্তিরই হৃদয় এই বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত। যাঁহারা বিবাহকে শুদ্ধ ইন্দ্রিয়সেবার উপায় স্বরূপ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগের মনে কোন অসুখ নাই। স্ত্রীর সহিত তাঁহারা শারীরিক মিলনেই পরম সুখী। স্ত্রী দেখিতে সুন্দরী হয়, ধনবান লোকের কন্যা হয়, এবং পুত্র প্রসবিনী হয়, তাহা হইলেই তাঁহাদের পরম সুখ। কিন্তু যাঁহাদিগের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইয়াছে, যাঁহাদিগের চিন্তাশক্তি উদ্দীপিত হইয়াছে এবং যাহারা সকল বিষয়ের তলস্পর্শ করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা ইহাতে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না। প্রচলিত বিবাহে তাঁহাদিগের হৃদয়ের শান্তি হইতে পারে না। হৃদয়ে হৃদয়ে, মনে মনে ও দেহে দেহে যে অদ্বৈত ভাব, তাহার অভাবে তাহাদের উচ্চ আদর্শ পূর্ণ হইতে পারে না। সুখের এই উচ্চ আদর্শের পরিতৃপ্তি বিরহেই অনেক সুশিক্ষিত যুবক শৃঙ্খল ভেদ পূর্ব্বক বেশ্যালয় গমন প্রভৃতি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন। যাঁহারা দাম্পত্য সুখের উচ্চ আদর্শ জানিতে পারেন নাই, তাঁহারা এক প্রকার সুখে আছেন। কিন্তু যাঁহারা একবার সেই উচ্চ আদর্শ জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা ইহার পরিতৃপ্তি বিরহে কখনই প্রশান্ত থাকিতে পারেন না। দাম্পত্য সুখে বঞ্চিত হতাশ প্রপীড়িত যুবকের হৃদয়ের যে কি যন্ত্রণা, তাহা বিনি-

অনুভব করিয়াছেন, তিনিই জানেন। আমরা সমাজ ও রাজ-বিধি হইতে যথেষ্ট সুখ লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমরা সে সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত আছি, তথাপি দাম্পত্য সুখে বঞ্চিত হইতে চাহিনা। আমরা পবিত্র দাম্পত্য সুখের বিনিময়ে প্রহরি-পরিবেষ্টিত গগনস্পর্শিনী অট্টালিকায় রত্নখচিত পর্য্যঙ্কে, বিবিধ বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিতে চাহি না। আমরা পর্ণশালায় বল্কল পরিধান করিয়া ভূমিশয্যায় শয়ন করি, তাহাতে আমাদের দুঃখ নাই, সমস্ত দিবস পর্য্যটনের পর স্বচ্ছন্দ বনজাত ফলমূল শাকাদি দ্বারা জীবন ধারণ করি, তাহাতেও আমাদের কষ্ট নাই; কিন্তু তথাপি যেন আমরা সাবিত্রী ও শকুন্তলার মত স্ত্রী পাই, তাহা হইলে সেই বল্কল আমাদের বহুমূল্য বস্ত্র; সেই ভূমি আমাদের দুগ্ধফেননিভ শয্যা এবং সেই ফল মূলাদি আমাদের বহুমূল্য মিষ্টান্ন হইয়া উঠিবে। যে বিষয়ে আমাদের জীবনের সমস্ত সুখ নির্ভর করিতেছে, সে বিষয়ে আমরা সমাজ বা রাজা কাহারও বাক্য সহ্য করিতে পারি না। সমাজ বা রাজবিধির দোষে, আমরা অসুখী হইলে যখন সমাজ বা রাজা আমাদিগের সে অসুখ নিবারণে অক্ষম, তখন তাঁহাদিগের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা কখনই উচিত নহে। এ বিষয়ে যাঁহারা সুখ দুঃখের ভাগী, তাঁহাদিগেরই এবিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত। এক্ষণে বিবাহ বিষয়ে প্রাচীন মনু কি বলিয়াছেন, এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাউক। মনু যখন বিপক্ষ কন্যাপক্ষীয়দিগকে হত-আহত করিয়া প্রাচীরাদি ভেদ পূর্ব্বক রোরুদ্যমানা ক্রোধান্বিতা রমণীর কৌমার্য্য হরণ করাও বিবাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তিনি যখন নিদ্রায়

অভিভূতা বা মদ্যপানে বিহ্বলা অথবা অনবধান যুক্তা রমণীতে নির্জ্জন প্রদেশে গমন করাও বিবাহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; তখন স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, ইচ্ছা পূর্ব্বকই হউক আর অনিচ্ছা পূর্ব্বকই হউক, সংসর্গ মাত্রকেই তিনি বিবাহ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহদ্বয় যে মনুর মতে অতি নিকৃষ্ট; তাহা নামকরণেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। তিনি এই অপকৃষ্টত্ব অবগত হইয়াও যে এতদ্বয়ের বিবাহত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহার অভ্যন্তরে গভীর অর্থ নিহিত আছে।

মনে কর, এইরূপ বলপূর্ব্বক বা অজ্ঞানাবস্থায় যে রমণীর কৌমারব্রত ভঙ্গ হইলে, তাহাতে অন্য পুরুষের সহিত বিবাহ দুর্ঘট হইয়া উঠিল এবং সেই বলকৃত বা অজ্ঞানকৃত সংসর্গে তাহার গর্ভ সঞ্চার হইল। এ অবস্থায় সেই সংসর্গকে বিবাহ বলিয়া স্বীকার না করিলে সেই হতভাগিনী রমণীর এবং তদ্গর্ভোৎপন্ন নিরপরাধ সন্তানের দশা কি হইবে? মনু এরূপ বিবাহকে বিধিবদ্ধ করিয়া অতি বুদ্ধিমান ও দূরদর্শীর কার্য্য করিয়াছেন সন্দেহ নাই। এরূপ ঘটনা যে সকল দেশেই সকল সময়ে ঘটিয়া থাকে, তাহা কে অস্বীকার করিবেন? কিন্তু এরূপ বিবাহ বলপূর্ব্বক চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা করা অনুচিত। যদি সেই রমণী সেই স্বামীর সহিত সহবাস করিতে না চান, বিধি বা সমাজের তাহাকে বলপূর্ব্বক সেই স্বামীর সহবাস করিতে বলার কোনও অধিকার নাই। এরূপ অনিচ্ছাস্থলে সেই বলকৃত বা অজ্ঞানকৃত বিবাহকে শুদ্ধ সাময়িক বিবাহ মাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করাই উচিত। মনু যে আট

প্রকার বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে গান্ধর্ব্ব ও প্রাজাপত্য বিবাহ ভিন্ন আর কোনও বিবাহের মূলেই পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনুরাগ নাই। হৃদয় ও মনের অদ্বৈত ভাবেই অনুরাগ জন্মে, যে বিবাহের মূলে বর ও কন্যার হৃদয় ও মনের অদ্বৈত ভাব ও তজ্জনিত অনুরাগ নাই, তাহা উৎকৃষ্ট বিবাহ মধ্যে গণ্য হইতে পারেনা। প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব বিবাহের মূলে এই অদ্বৈত ভাব আছে বলিয়া সে সকলকে আমরা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বিবাহ বলিয়া উল্লেখ করিলাম। এক-জন বর বিদ্যাবান সদাচার সম্পন্ন হইলেও যদি তিনি বিবাহার্থী না হন, যদি তিনি কন্যার প্রতি অনুরাগী না হন, তাহা হইলে তাঁহার হস্তে কন্যা সমর্পণ করিতে, সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রই ভীত হইবেন সন্দেহ নাই। বিদ্যা সদাচার সম্পন্ন অপ্রার্থক বরকে কন্যা সম্প্রদান করার নামই ব্রাহ্ম বিবাহ। এই ব্রাহ্ম বিবাহ অধুনা বিস্তীর্ণ রূপে হিন্দু সমাজে প্রচলিত থাকায় আজ কাল যে সকল অনিষ্ট সংঘটিত হইতেছে, তাহা কাহার অবিদিত? কন্যা অষ্টম বর্ষীয়া হইলেই জনক জননী তাহার বিবাহের জন্য ব্যাকুল হইয়া বস্ত্রালঙ্কার ধনাদির প্রলোভন দ্বারা কোনও সুশিক্ষিত পাত্রকে প্রলুব্ধ করিয়া তাঁহার হস্তে কন্যা সমর্পণ করেন। কন্যা অষ্টম বর্ষীয়া সুতরাং সে বিবাহ কাহাকে বলে, স্বামী কাহাকে বলে, আর পরিণামেই বা কি হইবে, কিছুই অবগত নহে। সুশিক্ষিত যুবক ভাবিলেন, বয়ো-বিদ্যাগুণে তাঁহার অনুরূপ ভার্য্যাত দুর্লভই; তবে যাহা কিছু অর্থ আত্মসাৎ করিতে পারা যায় তাহাই লাভ। কিন্তু এরূপ বিবাহের বিষময় ফল অচিরাৎ ফলিতে আরম্ভ হয়। অর্থ বা অন্য কোন দ্রব্যের

প্রলোভন শীঘ্রই তিরোহিত হয়। স্বামী ও স্ত্রী ক্রমেই দাম্পত্য প্রেমের অভিলাষী হইয়া উঠেন। দুর্ভাগ্য ক্রমে অনেক সময়েই তাঁহারা ইহাতে বঞ্চিত হন। যাঁহাদিগের যথেষ্ট ধৈর্য্য আছে, তাঁহারা এই রূপে হতাশ ও প্রপীড়িত হইয়াও চিরজীবন অতিকষ্টে অতিবাহিত করিতে পারেন। কিন্তু জীবন তাঁহাদিগের নিকট নির্জ্জন অরণ্যবৎ প্রতীয়মান হয়। কোন কার্য্যেই তাঁহাদিগের উৎসাহ থাকে না, এরূপ মানসিক অবস্থায় অবাধ ইন্দ্রিয় সংসর্গ যে কিরূপ বিশুদ্ধ ও প্রীতিপ্রদ তাহা যাঁহাদিগের ভাগ্যে ঘটিয়াছে, তাঁহারাই জানেন। দাম্পত্য প্রেমে হতাশ দম্পতীর যদি ধৈর্য্য বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে সংসার যে কি ভয়ানক স্থান হয়, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। স্বামীর স্ত্রীতে ও স্ত্রীর স্বামীতে যদি প্রণয়বৃত্তি চরিতার্থ না হয়, তাহা হইলে সেই বৃত্তি অন্য স্ত্রীতে বা অন্য পুরুষে চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা স্বভাবতঃ বলবতী হইয়া থাকে। যদি বিয়োজন (Divorce) প্রথা প্রচলিত থাকে, তাহা হইলে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য স্ত্রী বা অন্য পুরুষকে অনায়াসে বিবাহ করিতে পারেন। তাহা হইলে কোন বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। আমরা যে বিয়োজন প্রথার পক্ষপাতী তাহা ইংলণ্ড বা অন্যান্য ইউরোপীয় সভ্য সমাজের বিয়োজন প্রথার অনুযায়ী হয়, তাহা আমাদের অভিলাষ নয়। স্বামী ও স্ত্রীর একত্র অবস্থিতি অতিশয় ক্লেশকর হইয়া উঠিলে তাহাদিগকে পরস্পর বিয়োজিত করা উচিত। এরূপ অবস্থায় বল পূর্ব্বক তাহাদিগকে সংযোজিত রাখিবার চেষ্টায় যে কত গরলময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। দম্পতী সহিষ্ণু হইলে

কোন বাহ্য অনিষ্ট হয় না বটে, কিন্তু তাহাদিগের মন সতত বিষণ্ণ ও স্ফুর্ত্তিবিহীন হওয়ায় তাঁহারা উৎকৃষ্ট সন্তান জনন বা জগতের আর কোনো হিতসাধন করিতে পারে না। ক্রমেই তাহারা মনুষ্য বিদ্বেষী হইয়া উঠে। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় এরূপ স্থলে দম্পতীর উভয়ের বা অন্যতরের ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়া থাকে। স্ত্রীজাতির ধৈর্য্যচ্যুতি হইলেও তাহারা অনেক সময় কলহ বিবাদাদি দ্বারাই ক্রোধ শান্তি করিয়া থাকে। কিন্তু পুরুষ জাতির স্বাধীনতা আছে; সুতরাং তাহাদিগের ধৈর্য্যচ্যুতি হইলে তাহারা অনেক সময় নির্ভয়ে নায়িকান্তর অবলম্বন করিয়া অতৃপ্ত প্রায় বৃত্তি চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু স্ত্রীজাতির অতৃপ্ত প্রণয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার স্পৃহা বলবতী হইলেও তাহারা পুরুষ জাতির ন্যায় নির্ভয়ে ইহা চরিতার্থ করিতে পারে না। তাহাদিগকে নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু পুরুষ জাতির ন্যায় তাহারা সহজে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। পুরুষ জাতি প্রায় গৃহের বাহিরেই অভিলাষ পূর্ণ করেন, সুতরাং স্বীকার না করিলে প্রায় ধরা পড়েন না, কিন্তু স্ত্রীজাতির অবস্থা স্বতন্ত্র। তাহাদিগকে প্রায় গৃহের অভ্যন্তরেই মনোরথ পূর্ণ করিতে হয়। গৃহ পরিত্যাগ করিয়া এরূপ করিলে তাহাদিগকে সমাজচ্যুত হইয়া অবশেষে অগত্যা বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। যতদিন গর্ভ সঞ্চার না হয় ততদিন তাহারা গৃহের অভ্যন্তরে থাকিয়া কথঞ্চিৎ মনোরথ পূর্ণ করিতে পারে। কিন্তু গর্ভ সঞ্চার প্রণয় সম্মিলনের অনিবার্য্য ফল। গর্ভসঞ্চার হইলে প্রসূতির দুইটী বই পথ থাকে না। হয় গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গর্ভ রক্ষা নাহয় স্বহস্তে কুক্ষিস্থ

সন্তানের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক গৃহে অবস্থিতি। অসহায়া রমণী গৃহ পরিত্যাগ করিতে সাহসিনী না হইয়া অনেক সময় অগত্যা প্রিয়তম সন্তানের প্রাণ সংহার করে। কোন কোন সময় স্বয়ং সন্তানের প্রাণ বিনাশে অসমর্থ হইয়া উদ্বন্ধনে প্রাণ বিসর্জ্জন করে। যাহারা সন্তানের প্রাণ রক্ষার জন্য গৃহ পরিত্যাগ করে, সমাজ তাহাদিগকে প্রতিগ্রহণ করেন না; সুতরাং বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন ভিন্ন হতভাগিনীর আর কোনও উপায় থাকেনা। এইসকল ভয়ানক অনিষ্টপাতের জন্য কে দায়ী?- আমরা বলি প্রধানত সমাজ, দ্বিতীয়তঃ সমাজের অনুবর্ত্তন দ্বারা রাজবিধি। যদি সমাজ ও রাজবিধি নরনারীর বিবাহের অন্তবর্ত্তী না হইতেন, যদি তাহাদিগকে বিবাহ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেন, তাহা হইলে নর-নারীর গোপনে প্রণয়ের অনুসরণ করার কোন অবশ্যকতা থাকিত না। সুতরাং ভ্রূণহত্যা, স্ত্রীহত্যা, বেশ্যাবৃত্তি, ব্যাভিচার প্রভৃতি কিছুই থাকিত না। পূর্ব্বকালে কন্যা বয়স্থা হইলে পিতা নির্দ্ধারিত কোন দিনে দেশের কুমারগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন। কন্যা বরমাল্য করে লইয়া সভামণ্ডপে উপনীত হইয়া যাঁহাকে মনোনীত করিতেন তাঁহার গলেই বরমাল্য অর্পিত হইত। পিতা, তদন্তর মহা সমারোহে কন্যা সম্প্রদান করিতেন। এই প্রকার বিবাহ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পুরাণে এই বিবাহকে সয়ম্বরা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। *পূর্ব্বকালে কন্যা বয়স্থা হইলে পিতা নির্দ্দিষ্ট কোন দিনে সমস্ত কুমারগণকে আহ্বান করিতেন। সকলে সভাস্থ হইলে, কন্যা বরমাল্য লইয়া সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া মনোনীত পতিকে বরমাল্য অর্পণ করিতেন। তদন্তর পিতা মহাসমারোহে কন্যা

সম্প্রদান করিতেন। এই প্রকার বিবাহ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পুরাণে এই বিবাহকে সয়ম্বরা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যতদিন হিন্দু স্বাধীন ছিল, তত্তদিন এই বিবাহ প্রচলিত ছিল, কিন্তু যখন হিন্দু পরাধীন হইল, তখনই অষ্টবর্ষে, ভবেদ্‌গৌরী ইত্যাদি শ্লোকের সৃষ্টি হইয়া সয়ম্বরা প্রথা উঠিয়া গেল এবং তৎপরিবর্ত্তে বাল্যবিবাহের সৃষ্টি হইল। কেননা মুসলমানেরা সুশ্রী হিন্দু রমণী দেখিলেই বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়া বিবাহ করিত। এই জন্যই হিন্দুরা মেয়ের বিবাহ অল্প বয়সে দিতে লাগিলেন। এক্ষণে হিন্দুদিগের মধ্যে যে বিবাহ চলিতেছে সেই বিবাহকে ব্রাহ্ম-বিবাহ বলে। মনু লিখিয়াছেন যে, প্রাজা-পত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পিশাচ, এই পাঁচ প্রকার বিবাহের মধ্যে প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস এই তিন প্রকার বিবাহ সকল বর্ণেরই ধর্ম্ম। প্রাজাপত্যও গান্ধর্ব্ব বিবাহ বিষয়ে আমরাও মনুর অনুগমন করিলাম। কিন্তু রাক্ষস বিবাহ বলাৎকারমূলক; মনুর সহিত আমরা তাহার শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন করিতে পারিলাম না। প্রাজা-পত্যও গান্ধর্ব্ব বিবাহের মূলে পরস্পরের প্রতি অনুরূপ ব্যবস্থাপিত আছে বটে; কিন্তু মনু অষ্টম ও দ্বাদশ বর্ষ বয়সে কন্যার বিবাহের যে কাল নির্ণয় করিয়াছেন, সে সময় কন্যার অন্তরে অনুরাগের উদ্ভবের সম্ভাবনা নাই; সুতরাং ত্রিংশৎ বর্ষবয়স্ক ব্যক্তি অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে, মনুর এই বিধি প্রাজাপত্যও গান্ধর্ব্ব বিবাহের উপযোগী হইতে পারে না। এই উভয় প্রকার বিবাহেই বর ও কন্যার যুবা ও যুবতী হওয়া আবশ্যক। নতুবা বর ও কন্যার পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রায়ই একরূপ। উভয়েতেই বর ও

কন্যার পরস্পরের প্রতি অনুরাগ থাকা প্রথম প্রয়োজনীয়, তবে এই মাত্র প্রভেদ যে,প্রাজাপত্য-বিবাহে পিতা মাতা বা অভিভাবক-গণের অনুমতি সাপেক্ষ, এবং গান্ধর্ব্ব বিবাহ পিতা মাতা বা অভি-ভাবকগণের অনুমোদন নিরপেক্ষ। এই বিবাহদ্বয়ের পুনঃ প্রবর্ত্তনা অতীব প্রয়োজনীয়। মনু প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব বিবাহকে বিধিবদ্ধ করিয়া বিবাহে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি মনোনীতকরণে ভ্রম প্রমাদাদি নিরাকরণ জন্য অবিশৃঙ্খলিত বিয়োজন প্রথার প্রবর্ত্তন করেন নাই। বিবাহ তাঁহার মতে চিরস্থায়ী। একবার প্রজাপতি কর্ত্তৃক পতি ও পত্নী সম্বন্ধ সংঘটিত হইলে, বিক্রয়ে বা ত্যাগেও সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। তাঁহার বিধানানুসারে স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে বা দশবৎসর পর্য্যন্ত মৃতপ্রজা হইলে, বা একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত স্ত্রী সন্তান প্রসব অথবা অপ্রিয়-বাদিনী হইলে স্বামী তাহাকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু স্বামী সদাচারবিহীন, অন্য স্ত্রীতে অনুরক্ত বা বিদ্যাদিগুণ বিহীন হইলেও স্ত্রীর তাঁহাকে সতত দেবতার ন্যায় সেবা করিতেই হইবে। স্ত্রীর কিছুতেই নিস্তার নাই, পতি তাঁহাকে পরিত্যাগ করুন বা ভার্য্যান্তর গ্রহণ করুন, স্ত্রীকে আজী-বন তদনুধ্যান করিতেই হইবে। ইহাতেও স্ত্রীর যন্ত্রণার অবসান হইবে না। পতি প্রেত হইলেও স্ত্রী পুষ্প ফলমূলাদি দ্বারা বরং দেহের ক্ষপণ করিবেন, তথাপি অপর পুরুষের নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন না। শাস্ত্রের শাসন অপেক্ষা আমাদের বর্ত্তমান সমাজশাসন কঠোরতর। শাস্ত্রবৈষম্য দূষিত হইলেও স্থানে স্থানে স্ত্রীজাতির প্রতি কৃপাকটাক্ষ পাত করিয়াছেন; কথায় কথায় স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যান্তর পরিগ্রহের অনুমতি

করিয়াছেন বটে ; কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্যজাতীয়, পতিত, ক্লীব ও চিররুগ্ন স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া পত্যন্তর গ্রহণেরও ব্যবস্থা দিয়াছেন। শাস্ত্রে যেমন একদিকে স্বামীর মরণে বা অদর্শনে নারীকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে আদেশ করিয়াছেন, সেইরূপ স্বামী বহুদিন নিরুদ্দেশ হইলে, সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিলে, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে বা মরিলে স্ত্রীকেও অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। কিন্তু আমাদের সমাজ কোন অবস্থাতেই স্ত্রীর পত্যন্তর গ্রহণের ব্যবস্থা দেন নাই। স্বামী একবার বিবাহ করিয়া গিয়া চিরকাল নিরুদ্দেশ থাকুন, স্ত্রীকে চিরকালই স্বামীর শয্যা রক্ষা করিতে হইবে। স্বামী ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করুন, স্ত্রীকে হয় চির ব্রহ্মচর্য্য, অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে ; অথবা প্রবৃত্তি ও ধর্ম্ম-বুদ্ধির বিরুদ্ধে স্বামীর ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে। স্বামী চিররুগ্ন হউক, স্ত্রীকে আশৈশব স্বামীর সেই রুগ্ন শয্যায় বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে হইবে। স্বামী মৃত্যুগ্রাসে পতিত হউন, তথাপি তাহার অব্যাহতি নাই। তাহাকে আজীবন অতি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করিয়া সমাজের তুষ্টিবিধান করিতে হইবে। এরূপ কঠোর সমাজ-শাসন কখনই সম্পূর্ণ প্রতিপালিত হইতে পারে না। প্রকৃতির বিরুদ্ধে তুমি যতই কেন কঠোর নিয়ম করনা, প্রকৃতি আপনার স্বত্বসত্ব দখল করিতে চেষ্টা করিবেই করিবে।

এই সংঘর্ষের পরিণাম ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা ও বেশ্যা সংখ্যার বৃদ্ধি। শাস্ত্রে বিবাহ নানাপ্রকার ছিল। পুরুষজাতি যেমন আপনার মনোমত পত্নী বাছিয়া লইতে পারিতেন, স্ত্রীজাতিও

এক পদ্ধতি অনুসারে সেইরূপ আপনার মনোমত পতি নির্ব্বাচন করিতে পারিতেন। গান্ধর্ব্ব বিবাহ তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। শাস্ত্রের এই কারুণ্য-বলেই পতি-পরায়ণা শকুন্তলা ব্যভিচারিণী শ্রেণীর অন্তর্ভূক্তা হন নাই। শাস্ত্রে নানা প্রকার পুত্র স্বীকৃত হইত; এইজন্যে ভ্রূণহত্যা সংঘটিত হইত না। বর্ত্তমান সমাজের প্রণয় সঙ্গমের উত্তেজক কারণ, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান; অথচ প্রণয় সঙ্গমোৎপন্ন সন্ততি সমাজে গৃহীত হইবার ব্যবস্থা নাই। বর্ত্তমান সমাজের কঠোর শাসনে অসংখ্য রমণীকে হয় এই দুরপণেয় ভ্রূণহত্যা পাপে নিমগ্ন হইয়া সমাজের দাসীত্ব করিতে হইতেছে; অথবা দুর্নিবার মাতৃস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া সমাজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জঘন্য বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইতেছে। সেই ভ্রূণহত্যা ও সেই বেশ্যাবৃত্তির জন্য সমাজ দায়ী। কেননা, সমাজ স্খলিতপদ রমণীর জন্য উপায়ান্তর রাখেন নাই। সমাজ যাহাদিগকে পাপীয়সী বলিয়া ঘৃণা করেন, তাহারা কখন আপন ইচ্ছায় ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে বা বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে চাহে না। যে ঔদার্য্যগুণে মনু বিপক্ষ কন্যাপক্ষীয়দিগকে হত ও আহত করিয়া প্রাচীরাদি ভেদ করতঃ রোরুদ্যমানা বিপন্না রমণীর বল পূর্ব্বক কৌমারব্রত ভঙ্গ করাকেও বিবাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া এবং নিদ্রায় অভিভূতা বা মদ্যপানে বিহ্বলা অথবা অনবধানযুক্তা স্ত্রীতে নির্জ্জন প্রদেশে গমন করাকেও বিবাহ নামে আখ্যাত করিয়া, বলাৎকৃতা, হত-ভাগিনী রমণীরও তদ্‌গর্ভজাত নিরপরাধ সন্তানের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন; এবং যে ঔদার্য্যগুণে মনু কন্যা এবং বরের পরস্পরের প্রতি অনুরাগী হইয়া নির্জ্জনে সংসর্গ পূর্ব্বক পরস্পরের

সহিত মিলিত হওয়াকে উৎকৃষ্ট বিবাহ মধ্যে পরিগণিত করিয়া ভারতের রত্নস্বরূপ শকুন্তলা, সীতা, ও ভরত প্রভৃতিকে "ব্যভিচারজাত" এই অপবাদ হইতে মুক্ত করিয়াছেন; সেই ঔদার্য্য গুণেই মনু ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন, অপবিদ্ধ, ক্রীত, পৌনর্ভব, প্রভৃতি একাদশ প্রকার পুত্রকে বিধিবদ্ধ করিয়া, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বীরবর ভীমসেন, মহারথী কর্ণ ও অর্জ্জুন, মহামতি নকুল ও সহদেব, মহারাজ পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্র এবং ধার্ম্মিকপ্রবর বিদুর প্রভৃতিকে সমাজের উচ্চ সিংহাসন প্রদান করিয়াছেন। মানুষের যত প্রকার সন্তান হওয়া সম্ভব মনু তৎসমস্তকেই বিধিবদ্ধ করিয়া প্রগাঢ় বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, চৈতন্য ও মহম্মদ ভিন্ন জাতির আর কোনও ব্যবস্থাপক অদ্যাবধি মনুর এই গভীর মর্ম্মের উদ্ভেদ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা প্রকৃতির স্রোত বলপূর্ব্বক রোধ করিতে গিয়া, অনেক সময় সমাজে ভীষণ তরঙ্গ উত্থাপিত করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর এই উদার মত পরিত্যাগ করিয়া দায়ভাগ প্রণেতা জীমূতবাহনের সঙ্কীর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। জীমূতবাহন পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে শুদ্ধ ঔরস ও দত্তক পুত্র স্বীকার করিয়াছেন, তিনি আর দশ প্রকার পুত্রকে অস্বীকার করিয়া তাহাদিগকে সমাজ ও বিধির বহির্ভূত করিয়াছেন। মনুকে এরূপ অবমাননা করিয়া জীমূতবাহন হিন্দুসমাজের উপকার বা অপকার করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক; উপকার বা অপকারের নির্ণয় করিতে গেলে দেখিতে হইবে, বর্ত্তমান সময়ে অবশিষ্ট দশ প্রকার বা তাঁহাদিগের সন্তান

কোন প্রকার পুত্রের অস্তিত্ব সম্ভবপর কি না। যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে সমাজ ও বিধির বহির্ভূত করা অতি সঙ্কীর্ণমনা ও নৃশংসের কার্য্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। জীমূতবাহন যে শ্রেণীর পুত্রকে বিধিবহির্ভূত করিয়াছেন, আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, যে, সেই শ্রেণী হইতেই পূরাকালে অসংখ্য হিন্দু-কুলতিলক উৎপন্ন হইয়াছেন। যে ব্যাস ও পাণ্ডুপুত্রগণ না জন্মিলে মহাভারতের সৃষ্টি হইত না, যে সতীভূষণা সীতা জন্মগ্রহণ না করিলে রামায়ণের সৃষ্টি হইত না, কোন্ পাষাণহৃদয় ব্যক্তি তাদৃশ পুরুষরত্ন ও রমণীরত্ন হিন্দু সমাজ হইতে বহিস্কৃত করিতে চাহেন আমরা তাহা জানিতে চাই। ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে হিন্দুপুরাবৃত্তে ঘোর অন্ধকার উপস্থিত হয়, হিন্দু-সাহিত্য-সিন্ধু শুকাইয়া যায়। হিন্দু-হৃদয়ের প্রীতি-স্রোত সংরুদ্ধ হয়। এক সীতার সতীত্ব-বলে ভারত ললনা অদ্যাপি জগতের রমণীকুলের শিরোমণি হইয়া রহিয়াছেন, এক ব্যাসের রচনা-বলে ভারত সাহিত্যসমাজের অদ্যাপি উচ্চ সিংহাসন অধিকার করিতেছে, এক যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মবল, দুর্ব্বল ভারতবাসীদিগের অন্তরে অদ্যাপি ধর্ম্মবল প্রদান করিতেছে, এক ভীমের গদা ও অর্জ্জুনের গাণ্ডীব এখনও নির্ব্বীর্য্য আর্য্যজাতিকে ভাবী স্বাধীনতার আশা দিতেছে। যে আর্য্য নামে আমরা এত গর্ব্বিত, যে আর্য্য নাম শুনিবামাত্র আমরা উন্মত্ত হইয়া উঠি, সেই আর্য্যনামের গৌরব ইহাদিগেরই জন্য। আমরা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করি, সেখানেও দেখি, এই শ্রেণীর পুত্রের গৌরবে ইউরোপের মুখ উজ্জ্বল। যে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ও খৃষ্টীয় বীর্য্যের জয়ধ্বনি এক্ষণে জগতের প্রায় সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইতেছে

যে খৃষ্টীয় বীর্য্যের নিকট অকুল সাগরও গগনস্পর্শী পর্ব্বতও আর তুচ্ছ ভয় নাই, সেই খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ও খৃষ্টীয় বীর্য্যের প্রণোদক ক্রাইষ্ট মেরীর গর্ভজাত কানীন পুত্র। যে অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন লাপ্‌লাস জন্ম পরিগ্রহ করায় বিজ্ঞানভূমি ফ্রান্স নিউটন-জননী ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইতে পারিয়াছিলেন, সেই লাপলাসও এই শ্রেণীর পুত্র। কিন্তু লজ্জার কথা সুসভ্য ইউরোপও অদ্যাপি এইরূপ সন্তানদিগকে বিধিবদ্ধ করণে মনুর ন্যায় ঔদার্য্য প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। মনুর মত রহিত হওয়ায় মনুষ্যপ্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না; মনুষ্য-প্রকৃতি সেই এক ভাবেই রহিয়াছে। প্রকৃতির কার্য্য সমাজ ও রাজবিধি দ্বারা বিনষ্ট হইবার নহে। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ প্রকৃতির স্রোত রোধ করিতে গিয়া পাপের স্রোত পরিবর্দ্ধিত করিতেছেন মাত্র। পুরাকালে স্বামী মৃত, নপুংসক অথবা শক্তি বিহীন হইলে, স্ত্রীনিয়োগ ধর্ম্মানুসারে গুরুজন কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া, সপিণ্ড ব্যক্তিদ্বারা পুত্রোৎপাদন করিতেন এবং সেই পুত্র স্বামীর ক্ষেত্রজপুত্র রূপে গৃহীত হইত। এক্ষণে নিয়োগ ধর্ম্ম প্রচলিত নাই, তথাপি অনেক স্থলে স্বামী মৃত, নপুংসক অথবা শক্তিবিহীন হইলে স্ত্রী প্রকৃতি কর্ত্তৃক নিযুক্তা হইয়া সপিণ্ড বা অসপিণ্ড ব্যক্তি দ্বারা গর্ভ উৎপাদন করেন, কিন্তু সমাজভয়ে সেই গর্ভের বিনাশ সম্পাদন করেন। পুরাকালে স্বামীর অনুপস্থিতিকালে অন্য পুরুষ কর্ত্তৃক আপনার ভার্য্যাতে গূঢ়ভাবে পুত্র উৎপাদিত হইলে, স্বামী সেই অপরাধে ভার্য্যার প্রাণ সংহার না করিয়া সেই পুত্রটীকে আপনার গূঢ়োৎপন্ন পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিতেন। এক্ষণে অনুপস্থিতিকালে অন্য পুরুষ

কর্ত্তৃক আপনার ভার্য্যাতে গূঢ়ভাবে পুত্র উৎপাদিত হইয়াছে জানিতে পারিলে, স্বামী স্ত্রীর প্রাণ সংহার করিবেন, এই ভয়ে সেই স্ত্রী গর্ভের বিনাশ সম্পাদন করেন। পুরাকালে কন্যা পিতৃ-গৃহে থাকিয়া অপ্রকাশ্যে সন্তান উৎপাদন করিলে, ঐ কন্যাকে যিনি বিবাহ করিতেন, সেই ব্যক্তিই ঐ সন্তানটীকে আপনার কানীনপুত্র বলিয়া গ্রহণ করিতেন। এক্ষণে কন্যা কন্যা-বস্থায় পিতৃগৃহে থাকিয়া গর্ভবতী হইলে তাহার আর বিবাহের আশা থাকে না। এইজন্য জনক জননী লোকলজ্জাভয়ে কন্যার সেই গর্ভের বিনাশ সম্পাদন করেন। পুরাকালে জ্ঞাত-গর্ভা বা অজ্ঞাত-গর্ভা কন্যাকে যিনি বিবাহ করিতেন, ঐ গর্ভজাত পুত্র, সেই পরিণেতার সহোঢ়-পুত্র রূপে জনসমাজে পরিগৃহীত হইত। এক্ষণে জ্ঞাত-গর্ভাকন্যার বিবাহই অসম্ভব, সুতরাং তাহাকে বিবা-হের পূর্ব্বে গর্ভনষ্ট করিতেই হইবে, নতুবা তাহার বিবাহ হইবে না। অজ্ঞাত-গর্ভাকন্যার গর্ভ যদি দুই এক মাসের হয়, তবেই তাহার রক্ষা, নতুবা স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভার্য্যান্তর অবলম্বন করিবেন, এবং তাহাকে অগত্যা বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে। এরূপ ঘটনা কুলীনদিগের মধ্যে বিরল নহে। পুরাকালে স্ত্রী, পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা বা বিধবা হইলে, আবার অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিয়া উহাদ্বারা যে পুত্র উৎপাদন করিতেন, সেই পুত্র পরিণেতার পৌনর্ভব পুত্র নামে সমাজে গৃহীত হইত। এক্ষণে স্ত্রী স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলে, তাহার আর বিবাহের ব্যবস্থা নাই, সুতরাং সে অবস্থায় তাহার গর্ভ হইলে গর্ভ নষ্ট না করিলে, তাহার আর সমাজে থাকার আশা নাই। এই সকল কারণে বর্ত্তমান হিন্দু

সমাজ প্রতিদিন ভীষণ ভ্রূণহত্যার পাপে দূষিত ও কলঙ্কিত হইতেছে। আমরা কন্যাকে মনোমত পাত্রে ন্যস্ত করিবনা, অথচ স্বামী সহবাসে অসুখিনী কন্যার অন্যপুরুষ কর্ত্তৃক গর্ভ সঞ্চার হইলে জ্বলন্ত অনলের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিব এবং যে কোন উপায়ে সেই নিরপরাধ কুক্ষিস্থ জীবের প্রাণসংহার করিব। আমরা বিধবার বিবাহ দিব না, অথবা সেই বিধবার গর্ভ হইলে তাহা রক্ষা করিব না। আমরা পুত্র কন্যাদিগকে প্রকৃত প্রেমের অনুসরণে বিবাহ দিবনা, অথচ তাহারা স্বয়ং প্রকৃত প্রেমের অনুসরণ করিলে তাহাদিগকে আমরা ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী বলিয়া অধঃকৃত করিব। হয়ত অনেক সময় এরূপ ঘটিয়া থাকে যে, যাহাকে আমরা ব্যভিচার বলি, তাহাই প্রকৃত বিবাহ, এবং যাহাকে আমরা পবিত্র বিবাহ বলি তাহাই প্রকৃত ব্যভিচার। যতদিন বিবাহ-প্রথা সম্পূর্ণরূপে বিশোধিত না হইবে, ততদিন এই ব্যভিচার কখনই সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইবে না। বিবাহ-বিষয়ে সমাজের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করার নামই ব্যভিচার। যতদিন সমাজ বিবাহ-বিষয়ে অন্যায় নিয়ম সংস্থাপন করিবেন, ততদিন নরনারী সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করিবেই করিবে, কেহই রক্ষা করিতে পারিবেন না। কোন কালে কোন দেশে ব্যভিচার সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হয় নাই। কোন কালে কোন দেশে বিবাহপ্রথা যে সম্পূর্ণরূপে বিশোধিত হইবে তাহার আশা দেখা যায় না; সুতরাং কোনকালে কোনো দেশের ব্যভিচার সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইবে তাহারও আশা দেখা যায় না. এইজন্য মনুর ন্যায় উদারচেতা সূক্ষ্মদর্শী বিচক্ষণ পণ্ডিত ব্যভিচারোৎপন্ন নিরপরাধ সন্তানদিগকে বিধিও

সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাহাদিগকে "ব্যভিচার জাত" এই অপবাদ হইতে উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। মনু জানিতেন যে, ইহাদিগকে সমাজের বহির্ভূত করিলে ইহারা মনুষ্য বিদ্বেষী হইয়া উঠিবেন; সুতরাং ইহাদিগের দ্বারা জগতের অনিষ্ট বই ইষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। কিন্তু ইহাদিগকে সমাজের ক্রোড়ে গ্রহণ করিলে ইহারা জগতের অশেষ হিতসাধন করিবে। এই জন্যই তাঁহার এত প্রকার পুত্রের ব্যবস্থা। প্রতিগৃহে যাহা চলিতেছে, যাহা নিবারণ করিতে কেহ সক্ষম নহে, সেই মনুষ্য-সুলভ দুর্ব্বলতা লুকাইতে গিয়া আমরা গুরুতর ভ্রূণহত্যা পাপে নিমগ্ন হই। নরহত্যা মাত্রই গুরুতর পাতক সন্দেহ নাই, কিন্তু নিরপরাধ কুক্ষিস্থ জীবের প্রাণসংহাররূপ নরহত্যাপেক্ষা গুরুতর পাপ আর জগতে নাই।

মনু সূক্ষ্মদর্শী ও বুদ্ধিমান ছিলেন, সুতরাং এই সকল ভয়ঙ্কর অনিষ্টপাত নিবারণের জন্যই তিনি নানাপ্রকার পুত্রের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। আধুনিক স্মার্ত্তেরা তাঁহার এই গভীর বুদ্ধির ভিতর প্রবেশ করিতে না পারিয়া তাঁহার অতিশুভকর নিয়ম সকল উঠাইয়া দিয়া হিন্দুসমাজের শত্রুর কার্য্য করিয়াছেন সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সমাজ-সংস্কারক ও ব্যবস্থাপকেরা মনু প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রাকারদিগের গভীর বুদ্ধির অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন, ইহাই আমাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ইত্যাদি যেমন বহু জাতি বা শ্রেণীতে বিভক্ত, সেইরূপ শাক্ত, শৈব বৈষ্ণব ইত্যাদি উপাসক সম্প্রদায়ে বিভক্ত, তন্মধ্যে শাক্ত, শৈব, সৌর, বৈষ্ণব ও গাণপত্য এই কয়টাই প্রধান। যাঁহারা শাক্ত, তাঁহারাও হয়ত অনেকে বৈষ্ণব বিদ্বেষী, আবার যাঁহারা বৈষ্ণব তাঁহারাও প্রায়ই শাক্তের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন। শাক্তেরা ফোঁটাতিলক, তুলসীপত্র দেখিয়া খেপিয়া উঠেন, আবার বৈষ্ণবেরাও বিল্বপত্রও জবাফুল দেখিয়া অগ্নিশর্ম্মা হন। তাঁহারা বলেন বিষ্ণুই সকল দেবের মূল—তাঁহার উপাসনা ভিন্ন জীবের মুক্তি নাই, এইরূপ শাক্ত ও বৈষ্ণবেরা পরস্পর বিবাদ করিয়া থাকেন। কেবল তাহাকে সদ্‌গুরুর উপদেশেও শাস্ত্র জ্ঞান লাভ করে নাই বলিয়াই এইরূপ ভ্রমান্ধকারে পতিত। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ বুঝিয়াছিলেন যে অনন্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে, তাই তিনি শাস্ত্রালোচনার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতেন. তাহাকেই গুরুপদে বরণ করা হইত। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণেরাই এ অধিকার বেশী পাইয়াছিলেন, তদবধিই গুরু করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আজ কাল সে গুরু নির্ব্বাচন ও বল্লাল প্রদত্ত কৌলীন্য প্রথার আকার ধারণ করিয়াছে। আমার পিতামহ যাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া গুরু নির্ব্বাচন করিয়া ছিলেন, এখন তাঁহার পৌত্রের ব্রহ্মজ্ঞান ত দূরের কথা, বিদ্যা বুদ্ধিহীন একটা গণ্ডমূর্খ হইলেও

তাঁহাকেই আমার গুরুপদে বরণ করিতে হইবে। যতদিন না জনসমাজ উপযুক্ত গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ না করিয়া ব্যবসায়ী গুরুর অর্চ্চনা করিবেন ততদিন তাঁহাদের অজ্ঞানতা নাশের কোন উপায় নাই। তর্কস্থলে সকলে আপন আপন উপাস্য দেবতার শ্রেষ্ঠত্ববর্ণনে মনোযোগী হয়েন। তাঁহারা এটি বোঝেন না যে, শিব, শক্তি, বিষ্ণু যতরূপের কথাই শাস্ত্রে লিখিত আছে এ সমস্তই কল্পিত রূপ, একথা শুধু আমি বলিতেছি না, "উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা, সাধকেরা অনেকেই অনন্তের ধ্যান ধারণায় অসমর্থ, তাই ঋষিগণ এই শিব শক্তি বিষ্ণু ইত্যাদি ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। যদি কেহ এরূপ বলেন যে, কল্পিত রূপের উপাসনা করিয়া কি ফল ফলিবে? তাহার উত্তরে বলিতেছি যে, ভগবান, যখন সর্ব্বশক্তিমান, অন্তর্যামী ও ভক্তবৎসল, তখন তিনি ভক্তের হৃদয়ের ভাব গ্রহণ করিয়াই যে যে রূপের উপাসক, তাঁহাকে সেই রূপেই দেখাদিবেন, ইহাতে আর সংশয়ের বিষয় কি আছে? আজকাল অনেকেই হিন্দু ধর্ম্মের বিশ্বজনীন ভাব গ্রহণ না করিয়া পৌত্তলিকতার উপরই বিশেষ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। হিন্দুধর্ম্মে আস্তিক ও নাস্তিক অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদী, সাকারবাদী ও নিরাকরবাদী, শাক্ত, ও বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম ও অব্রাহ্ম, সকলেই অপরিত্যাজ্য সকলেই আদরণীয়। হিন্দু ধর্ম্মে বলেন যে সকলকেই ঈশ্বরের রূপকল্পনা করিয়া পূজা করিতে হইবে। আবার রূপ কল্পনা করিলে যে উপাসনা অসিদ্ধ হইবে একথাও শাস্ত্রে বলেনা। সাধকের বিকাশভেদে উপাসনা ভেদ হিন্দু ধর্ম্মের চরম উৎকর্ষের লক্ষণ। হিন্দুধর্ম্মে ব্যক্তিভেদে জড়োপাসনা হইতে, অনন্তের উপাসনা ব্যবস্থা

করিয়া গিয়াছেন। ইহা ব্যক্তিভেদে ইষ্টদেবতা স্বতন্ত্র করিয়া গিয়াছে। যে শালগ্রাম শিলার উপাসক, সেও হিন্দু, এবং যে অখণ্ড অজ্ঞাত অজ্ঞেয় ও অবাঙ্মনসগোচর ব্রহ্মের উপাসক সেও হিন্দু, যে ভক্তিবাদী সেও হিন্দু, যে জ্ঞানং ব্রহ্মবাদী সেও হিন্দু। যে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ববাদী সেও হিন্দু, যে ঈশ্বরের বিশ্বরূপত্ববাদী সেও হিন্দু। যে হিন্দু ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়াছে, তাহার নিকট কোন প্রকার ভেদবুদ্ধি থাকিতে পারে না। প্রকৃত অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্য হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মহিমা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই চণ্ডালের শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। প্রকৃত অদ্বৈতবাদীর নিকট সকলই বিশ্বরূপ ভগবানের প্রতিকৃতি বলিয়া প্রতীতি জন্মিবে। সুতরাং জাতি-গত, ধর্ম্মগত, বর্ণগত ভেদ তাঁহার নিকট হইতে একবারেই চলিয়া যাইবে। জাত্যাভিমান, বংশমর্য্যাদার অভিমান বা কোন প্রকার অভিমান তাঁহার থাকিতে পারে না, তাঁহার নিকট হিন্দু ও যবন ব্রাহ্ম ও অব্রাহ্ম, শ্বেত ও কৃষ্ণ ভেদ কিছুই থাকিতে পারে না। এই প্রকাণ্ড বিশ্বজনীন ভাবে, শঙ্করাচার্য্য বিশাল ও উদার বৌদ্ধধর্ম্মকেও হিন্দু ধর্ম্মের কুক্ষিগত করিতে পারিয়াছিলেন। যে যেখানে হিন্দু হইতে চাহিয়াছিল, তাহাকেই তিনি হিন্দু করিয়া লইয়াছিলেন। ভারতে আবার হিন্দু ধর্ম্মের সেই বিশাল ও উদার ভাবের আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছে। সঙ্কীর্ণ ভাবে ভারতের আর মঙ্গল নাই। যে ধর্ম্ম সমস্ত ভারতকে, অন্ততঃ ভারতের অধিকাংশ অধিবাসীকে এক ধর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ করিতে পারে, সেই ধর্ম্মই আমাদের আরাধ্য। ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে আমরা এক সময়ে এই আশা করিয়াছিলাম; কিন্তু

ব্রাহ্মধর্ম্ম ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ ভাব ধারণ করায় সে আশা গিয়াছে। এক্ষণে হিন্দুধর্ম্মের বিশ্বজনীনভাবে যে মহাপুরুষ আবার ভারতকে অনুপ্রাণীত ও ঘণীভূত করিতে পারিবেন, তিনিই আমাদের পূজার পাত্র হইবেন সন্দেহ নাই। যিনি হিন্দু ধর্ম্মের বিশ্বজনীন ভাবে, ও বিশাল প্রেমোচ্ছ্বাসে ব্রাহ্মসমাজ এবং দেশীয় খৃষ্টীয় ও মুসলমান সমাজকে হিন্দু সমাজের কুক্ষিগত করিতে পারিবেন, তিনি ভারতবাসী মাত্রেরই উপাস্য দেবতা। সে মহাপুরুষের চরণে আমরা উদ্দেশে নমস্কার করি; কিন্তু যিনি তাহা না করিয়া ধর্ম্মের নামে, ঈশ্বরের নামে, সহস্রধা বিদীর্ণ ভারতবক্ষের ক্ষত আরও বাড়াইবেন, তিনি ভারতের মিত্র নহেন—যে ধর্ম্ম ভারতে আরও দলাদলি বাড়াইতে চাহে, যে ধর্ম্ম-ধ্বজগণ দগ্ধপ্রায় ভারতে আরও ধর্ম্মবিদ্বেষানল প্রজ্জ্বলিত করিতে চাহেন, আমরা তাদৃশ ধর্ম্ম বা ধর্ম্ম-প্রচারককে দূর হইতে নমস্কার করি। যে ভাবে বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য গুরুগোবিন্দ, চৈতন্য ও রামমোহন রায় প্রভৃতি ধর্ম্ম সংস্কারকগণ ভারতের একীকরণ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেইভাবে আবার ভারতের একীকরণ আরম্ভ করিতে হইবে। ইহা সম্প্রদায় বা ব্যক্তি বিশেষের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ দ্বারা হইবে না। সর্ব্ব-জনীন প্রেম ব্যতীত পূর্ণ অভেদজ্ঞান ব্যতীত গভীর আত্মবিস্মৃতি ব্যতীত এ সাধনায় কথনই কেহ সিদ্ধ হইতে পারিবেন না।

হে সর্ব্বশক্তিমান ভগবন্। তুমি যুগে যুগেই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাক। হে প্রভু! আবার সেই বর্ণ ভেদ, সেই জাতিভেদ, সেই ধর্ম্মভেদ, আবার ব্রাহ্মণ শূদ্রে ও হিন্দু মুসলমানে, সেই ঘোরতর বিদ্বেষ! স্ত্রীজাতির

প্রতি আবার সেই ঘোরতর অত্যাচার। আবার হিন্দুস্থান আচারহীন হইতে বসিয়াছে। এই সময় আর একবার চৈতন্য রূপে অবতীর্ণ হইয়া হরিনামের মোহিনীমন্ত্রে বৌদ্ধ, ম্লেচ্ছ, যবনকে নিষ্কাম বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত কর। আবার ভারতের ঘরে ঘরে হরি সংকীর্ত্তন প্রচার হউক। আবার ব্রাহ্মণ চণ্ডালে অভেদ জ্ঞান জন্মিয়া প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া কোলাকুলি করুক। আবার গগনভেদী হরিধ্বনিতে ভারতবর্ষ নিনাদিত হউক। আবার সনাতন হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বত্র বিঘোষিত হউক।

সমাপ্ত।